দেশ-দেশান্তর

প্রবোধকুমার সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—দুই টাকা বারো আনা—

চতুর্থ সংস্করণ

আষাঢ় ১৩৫৯

১৯৩০—৩১ সালে এই বইয়ের অন্তর্গত খণ্ড খণ্ড ভ্রমণের চিত্রগুলি লিখেছিলাম। সবগুলোই নানা সাময়িক পত্রে ছাপা হয়েছিল। বই প্রকাশ করার সময়ে অনেক জায়গায় অদল-বদল ও যোগ-বিয়োগ করেছি।

প্রবোধকুমার সান্যাল

দেশ-দেশান্তর

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত হীরালাল দাশগুপ্ত

শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী

করকমলেষু—

মানুষের জীবন নাকি নদীর মতো; নিরুদ্দেশ তার গতি অথচ লক্ষ্যহীন নয়! নদীর মতো জীবনও হয়ত আপনাকে সৃষ্টি করে' আপন পরিণতির দিকে আকৃষ্ট হয়ে ছোটে। নদীর যেমন আবর্ত্ত, জীবনে তেমনি ঘটনা। এই ঘটনাই মানুষের বিস্ময়, মানুষের সুখস্মৃতি। এই আবর্ত্তগুলিই জীবনের নাটক ও গল্প। মানুষের মন চিরদিন ধরে' এই নাটক ও গল্পগুলির চারিপাশে ভ্রমরের মতো গুঞ্জরণ করতে থাকে।

নদীর প্রবাহটি যেমন আপন প্রাণের মধ্যে একটি বিশেষ আবর্ত্তকে বারম্বার স্মরণ করে' চলে, আমিও তেমনি ১৯২৮ সালের ১৭ই নবেম্বরের রাতটিকে ভুলতে পারিনে। সে একটি কৃষ্ণকায়া জনবিরল যন্ত্রণাদায়ক শীতরাত্রি,—ভয়ার্ত্ত ও আড়ষ্ট। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পেশাওয়ারের পথে শেষ-প্যাসেঞ্জার-ট্রেণে চলেছি,—গাড়ীর গতি মৃদুমন্থর; তার কারণ ভোরের আগে কোন ট্রেণের পেশাওয়ারে পৌঁছাবার হুকুম নেই,—অন্ধকারের আবরণে লুণ্ঠন ও হত্যার ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা।

মধ্যরাত্রি। গাড়ীখানা যেন সেই অন্ধকারকে বিদ্ধ করে' তার রহস্যময় গহ্বরে হাতড়ে চলেছে। কিছুক্ষণ আগে তক্ষশীলা পার হয়ে গেছে। আমার সঙ্গী কেউ নেই,—তার মানে এমন নয় যে, আমি সাহসী,—সঙ্গীর অভাবেই আমি একা। ট্রেণের দুই পাশে

ঘনবৃক্ষসঙ্কুল অরণ্য, কিম্বা সুবিস্তৃত প্রান্তর, অথবা সীমাহীন সাগর, সে সব কিছুই বোঝবার উপায় নেই, অন্ধকারে সমস্তই নিশ্চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে অন্ধকারের পারে আকাশ নেই,—তার উপর নেমেছে হিমকুহেলিকা! মনে হয় লক্ষ লক্ষ অন্ধ-দানবী আপন আপন পক্ষ বিস্তার করে' পৃথিবীর বুকের পরে বসে' টু টি টিপে ধরেছে।

গাড়ী থামে না, অথচ অতি ধীরে ধীরে এমন এক রাজ্যের দিকে চলে, যা সম্পূর্ণ অজানা ও ভয়সঙ্কুল, তবে সে অত্যন্ত যন্ত্রণাময়। সে কেবলই হাত্ড়ে চল্ছে আবরণের পর আবরণ সরিয়ে অন্ধকারের অন্দর-মহলে। বেগ নেই, বিচ্ছেদ নেই, অনির্দ্দিষ্ট গতি। এদিকে কঠিন ঠাণ্ডায় হাতের ঘড়ি ও নিশ্বাস দুই বন্ধ হয়ে এসেছে। আমার এ ভ্রমণ সৌখীন নয়, বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষ্যে নয়, এর মধ্যে পথের টানটাই বড; অশ্রান্ত গতিবেগের আকর্ষণ। যাই হোক, গাডীতে একা নই, পাশাপাশি বেঞ্চিতে আপাদমস্তক আবৃত দুটি বিরাট দেহ,—তারা নর কি নারী জানবার উপায় নেই। পরম্পরায় অবগত আছি, এ পথে গাড়ীর মধ্যে মারামারি হ'লে, খুন-জখম হ'লে অথবা চুরি-ডাকাতি হ'লে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ গ্রাহ্য করেন না। এ-দেশ নাকি আত্মরক্ষার দেশ, যথেচ্ছ আচার এবং অবাধ গতিবিধির স্বাধীন এলাকা। সিংহ-বিবরের মুখে শশকের মতো ভীত দৃষ্টিতে তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়ল, গাড়ীর মধ্যে 'এলার্ম্ সিগ্নাল' নেই। ভয়ার্ত্ত হয়ে একবার আপন হৃদ্‌পিণ্ডকে অনুভব করলাম! দম আটকাবে নাকি? গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়বো? এই দুটি নিদ্রিত ব্যক্তি হঠাৎ উঠে যদি গলা টিপে ধরে?—অসহায় বাঙালীটির গলার ভিতর থেকে আর্ত্তনাদ উঠে আস্তে লাগ্ল।

সমস্ত রাত এমনি করে' কাটল। পেশাওয়ার ষ্টেশনে যখন নামলাম তখনো চারিদিকে অন্ধকার। জানা গেল সকাল ছ'টা বাজে। শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর চিমনীর ধোঁয়ার মতো হিম,—এক জায়গায় স্থির হয়ে সত্যিই দাঁড়াবার উপায় নেই। কিন্তু হঠাৎ এই অজানা অপরিচিত জায়গায় যে এতগুলি বন্ধু জুট্‌বে তা আগে জানা ছিল না। গত রাত্রির ভয় তখনো সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল, গা ঝাড়া দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে একবার মাতব্বরের মতো পায়চারি সুরু করলাম। দু' তিনটি হোমরা-চোমরা পাঠান এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি চা খাবো কি না, পথে হয় ত কষ্ট পেয়েছি, কোথায় যেতে চাই, কোন্ ঠিকানায়, গাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে দেবে কি না,—সমস্তটাই যেন তোষামোদের সুর। একজন বলেই ফেল্‌লো, আমার অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতে তারা তিন চার জন সমস্ত পথ গাড়ীর আশে পাশে আমাকে পাহারা দিতে দিতে এসেছে। এই কাঁচা গোয়েন্দাগুলির সানুগ্রহ প্রস্তাবাবলী সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে' চা খেতে বসলাম। শেষকালে তারা একখানা ছাপা পুলিশ অফিসের ফর্ম্ বা'র করল, তাতে নাম ধাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখে দিলাম। আমি যে রাওয়ালপিণ্ডির সৈন্যদলের লোক তাও জানাতে হ'ল। হেসে কবির কথায় তাদের বল্‌তে ইচ্ছে হোলো—'অনুগ্রহ করে' এই ক'রো যেন অনুগ্রহ ক'রো না।'

সকাল হোলো, রোদ উঠ্‌লো। ভয়ানক একটি দুঃস্বপ্নের পর রাজকন্যা যেমন ঘুম থেকে জেগে উঠে সুমুখেই দেখে রাজপুত্র, তেমনি করে' পেলাম সেদিনের সেই সকালটিকে। সুকঠিন দুশ্চর তপস্যাশেষে যেন বরলাভ হোলো। অন্ধকারের পর এমন দিনের আলো—যেন এক ভীষণা রাক্ষসীর গর্ভ হতে একটি সুন্দর দেবশিশুর জন্ম হয়েছে;

আকাশে আকাশে তার প্রভাতী উৎসব, নবসূর্য্যের রক্তরশ্মিতে তার জন্য আশীর্ব্বাদ। আনন্দে চারিদিকে একবার হেসে চাইলাম, নূতন করে' পৃথিবীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি ঘট্‌ল।

ছোট ষ্টেশন, যতদূর মনে হয় একটিমাত্র প্লাট্‌ফরম্‌। এটী ছাউনী-ষ্টেশন্‌, পেশাওয়ার সিটী-ষ্টেশনে নাম্‌লে নাকি কোন অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্ভাবনা থাকে। গোরাছাউনীতে নামাই ভালো। ষ্টেশন পার হয়ে এসে দেখা যায় শহরটিও ছোট—গুটিকয়েক দোকান, একটি বাজার, কয়েকখানি টাঙা, দু-একটি অফিস। মানুষের বসতি আছে কিন্তু সমাজ নেই; দেনা-পাওনা আছে কিন্তু শৃঙ্খলা নেই। প্রথমেই মনে হবে সমস্ত শহরটি যেন আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একটি ভয়ের ছায়া—সন্ত্রস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত। মানুষ এখানে বসে' অহরহ যেন হিংস্র নখর শান্‌ দিচ্ছে। পথে নেমে একখানি টাঙা ভাড়া করে বাবুমহল্লার দিকে চললাম। বাবুমহল্লায় জনকয়েক বাঙালী থাকেন।

দিকে দিকে সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজ সুরু হয়েছে। পথের পাশে পাশে পাহারা দিচ্ছে ঘোড়সওয়ার, উট চল্‌ছে মাল-বোঝাই নিয়ে, কোথাও কোথাও বা কাফিখানায় পাঠানরা বসে জটলা করছে। ভাঙা-ফুটো কতকগুলি বিচিত্র বাড়ীঘর, জীবন-যাত্রা ও গৃহস্থালী অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, স্ত্রী-পুরুষদের অঙ্গসজ্জা অতিরিক্ত অপরিষ্কার। মনে হয় তাদের দেশ আর্য্যভূমি ভারতের সীমান্তে না হয়ে আরব কি আফ্রিকায় হ'লে ভাল হ'ত। দু'ধারে দেখতে দেখতে চলেছি। এ-দেশের সবাই যেন অস্থায়ী বাসিন্দা, সবটাই যেন ধর্ম্মশালা, যে-কোনো মুহূর্ত্তে সকলেই যেন স্থানত্যাগ করে' যেতে পারে—মাটির সঙ্গে যেন কা'রো যোগাযোগ নেই, আত্মীয়তা নেই। কোনো

একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়ের ফুৎকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার জন্য আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রতীক্ষা করে' রয়েছে।

বাবুমহল্লা পাওয়া গেল। গাড়ী থেকে নেমে সন্ধান করতে করতে দেখা গেল একখানি জীর্ণ একতালা বাড়ীর ন্যাড়া ছাদে একখানা লালপেড়ে শাড়ী ঝুলছে। শাড়ীটি যেন দূর বাঙালা দেশের শ্যামশোভা ও কমনীয় মমতার সংবাদ বহন করে' এনেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজায় উঠে কড়া নাড়লাম। একটু পরেই দরজা খুলে একটি ভদ্রলোক দেখা দিলেন। এই অপ্রত্যাশিত বাঙালীটিকে বহুদিন পরে দেখে হঠাৎ অত্যুগ্র আনন্দে মুখ দিয়ে কথা সরল না, শুধু হেসে নমস্কার করলাম। ভদ্রলোক নমস্কার নিলেন বটে, কিন্তু একবার চকিত চোখে আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে বললেন, আপ্ কাঁহাসে আতে হেঁ?

বললাম, কি বলছেন, আমি যে বাঙালী!

অ্যাঁ? বাঙালী? আমি মনে করেছি বুঝি,—আসুন আসুন, কি আশ্চয্যি, আপনাকে চেনবারই উপায় নেই, ঠিক পাঞ্জাবীর মতন—

মাথার পাগ্‌ড়িটা খুলে রাখলাম। ভদ্রলোক চমৎকার আলাপ সুরু করলেন, যেন বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। খাইবার-পাস্ যাবো শুনে তিনি খুসী হলেন। তিনি চাকরী করেন সি-এম-এস্-এ। তাঁর বড় ভাই পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর, পিণ্ডিতেই তাঁর বাস। দেশ ছেড়ে পেটের দায়ে প্রবাসে পড়ে' থাকা অত্যন্ত ঝকমারি—ইত্যাদি। কিয়ৎক্ষণ পরে ভেতর থেকে চা প্রভৃতি এসে হাজির হোলো।

আমার পায়জামার নীচে ধুতি পরণে ছিল, পায়জামাটা ছেড়ে এতক্ষণে 'বাঙালী' হলাম। ননীগোপালবাবু জানালেন, এখনই

যাত্রা করলে সন্ধ্যার সময়ে ফেরা সম্ভব হবে, নইলে সেখানে রাত্রিবাস করার জায়গাও নেই, নিরাপদও নয়। সুতরাং চা খেয়েই উঠতে হোলো। তিনি মোটরে উঠিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে চললেন, বেশ জমিয়ে আলাপ করবার আর অবসর পাওয়া গেল না। আমার কম্বল ও পায়জামা তাঁর বাসাতেই রইল, ফেরবার মুখে তাঁর এখানে সান্ধ্যভোজ সেরে নিয়ে যাবো।

চলতে চলতে তিনি বললেন—খুব ঘিঞ্জি জায়গা মনে হচ্ছে আপনার—নয়? তবে যান না একবার পেশাওয়ার শহরে, দেখে আসুন গে। নাকে কাপড় দিয়েও টেঁকতে পারবেন না। কিন্তু বেটারা ভারি সুন্দর দেখতে।...তেমনি কি মেয়েগুলো মশাই? ইচ্ছে করে সব কটার সঙ্গেই মালাবদল করি!-- দুজনেই হাসলাম। তিনি আবার বললেন—সারা ভারতে এমন শক্তিশালী যুদ্ধপ্রিয় জাতি আর কোথাও নেই। ইংরেজ ভায়ারা তাই ত শান্তি পায় না! এই Frontier Provinceটাই হচ্ছে তাদের চোখে সব চেয়ে সন্দেহজনক। বাইরে কাবুল, বলশেভিক রাশিয়া, দুধারে অসভ্য স্বাধীন পাঠান আর ঘরের মধ্যে এই পেশাওয়ারী। অথচ ইংরেজদের এই পাঁচিল যদি ভাঙে ত সমস্ত উত্তর ভারতটাই হয়ত বেহাত হয়ে যাবে। এখানে এমন কলকাঠি আছে যে ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে দশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে পারে। উড়ো জাহাজের বন্দোবস্ত দেখেছেন ত? আমরা সাধারণতঃ সমাজ-রক্ষার তোড়জোড় দেখতেই অভ্যস্ত কিন্তু এখানে দেখবেন একটা দেশ আর একটা দেশের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করছে; একটা জাতি আর একটা জাতির আক্রমণের ভয়ে সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে আছে। পেশাওয়ার না দেখলে বৃটিশ-ভারতের

শক্তির পরিমাণ কিছুই বোঝা যায় না।—এমনি নানা গল্পের পর এক সময় তিনি বিদায় নিলেন।

দু'টাকা ভাড়ায় মোটর বাস-এ উঠলাম। ছোট গাড়ী, মালপত্র সমেত আন্দাজ জন-দশেক যাত্রী। দু'জন দেশী গোরা, দুটি পাঠান স্ত্রীলোক, জন চারেক পাঠান ও একটি শীর্ণকায় চঞ্চল মাদ্রাজী যুবক। যুবকটি এসেছে নাকি 'সাইমন্ কমিশনের' সঙ্গে। আজ সাইমন্ সাহেব আসবেন খাইবার-গিরিবর্ত্ম ভ্রমণে।

বেলা সাড়ে আটটা আন্দাজ গাড়ী ছাড়লো। পেশাওয়ার সহর পার হয়ে পড়লো বিখ্যাত খাজুড়ীর মাঠ। অসীম অনুর্ব্বর মরুভূমি। লম্বায় চওড়ায় নাকি প্রায় তিনশো মাইল। এ মাঠের সামান্য একটি সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়া আর কিছুই ভারত সরকারের অধীনে নয়। এই বিশাল প্রান্তরের দূর কিনারায় পর্ব্বতের সারি। সকালের সূর্য্যের আলোয় এতদূর থেকেও গলিত তুষারের বিচিত্র বর্ণের সমারোহ দেখা যাচ্ছিল। আকাশ এবার পরিষ্কার হয়েছে। নীল আকাশের নীচে পর্ব্বতের তুষারকিরীটের আরক্ত শোভা একটি জাগ্রত কবিতার মতো চেয়ে রয়েছে। প্রকৃতির নয়নাভিরাম রূপের প্রতি আমাদের দেহের সমস্ত তন্ত্রীগুলি একসঙ্গে পরম তৃপ্তিতে সাড়া দিয়ে ওঠে—প্রাকৃতিক শোভা উপভোগের গোড়ার কথাই এই।

মাদ্রাজী ছোকরাটি ছট্‌ফট্ করে' অনেক কথা বলতে লাগলো। হুঁ হাঁ দিয়ে সারলাম। ননীবাবুর কথাগুলি তখনও কানে বাজছিল। গোরা-ছাউনী পার হ'তে মিনিট দশেক লাগলো। দুধারে সারি সারি গোরাদের ক্যাম্প। হাজার হাজার সশস্ত্র সৈন্য দিনের পর দিন অনির্দ্দিষ্ট যুদ্ধের আশায় দিন কাটাচ্ছে। গোরাবাসের চেয়ে প্রত্যেক-

টাকে কেল্লা বললেই ঠিক ভাল শোনায়। আশপাশে রাস্তার ধারে গুটিকয়েক দোকান, বাজার, মোটরের কারখানা, কয়েকটা আফিস-বাড়ী। রাস্তার চারিদিকেই অবিরাম পুলিশ পাহারা, সশস্ত্র গোরা, উটের যাত্রী, ঘোড়ায় চড়া বড় বড় অফিসার—চারিদিকেই যেন সশঙ্ক সন্দেহ! ক্রমে রাস্তা জনহীন হয়ে এল। চারিদিকে সীমাহীন প্রান্তর। মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তায় বিদ্যুদ্বেগে মোটর চলেছে। রাস্তার ধারে ধারেই খাইবার রেলপথ চলে গেছে। এই রেলপথ আর রাস্তাটি ছাড়া আর সমস্তই ইংরেজের অধিকারের বাইরে। চারিদিকে তাকিয়ে ভাবলাম, এই ত বিশাল রণক্ষেত্র!

এই রণক্ষেত্রের মৃত্তিকার নীচেই ত প্রাচীন দিনের রক্তাক্ত ইতিহাস সমাধিস্থ হয়ে আছে।

দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ জুড়ে সে দিন অল্প অল্প মেঘ করে' সূর্য্যের আলো ঢেকে দিল। শীতের হাওয়া তেমনই ঠাণ্ডা। যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের দিকে চেয়ে বসে' রইলাম। কোথায় চলেছি যেন খেয়ালই নেই। দূরে পাহাড়ের গর্ভে গিয়ে পথরেখা মিলিয়ে গেছে। একদৃষ্টে একদিকে তাকিয়ে সঙ্গীহীন একাকীত্বকে মনে মনে অনুভব করতে লাগলাম। খানিক পরে এল ইস্‌লামিয়া কলেজ। মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একখণ্ড জমি নিয়ে কলেজ তৈরী হয়েছে। শুনলাম পাঠানদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট এই কলেজ বানিয়ে দিয়েছেন। নানা ভাষা এখানে শেখানো হয়; সরকারী দপ্তরে চাকরীও পায় শুনলাম। ছাত্র সংখ্যা সন্তোষজনক।

ইস্‌লামিয়া কলেজ পার হয়ে গেল। এবারে পথের দিকে নজর পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। ক্বচিৎ এক আধজন শ্রমিক পথিক

চলেছে কিন্তু সকলের কাঁধেই একটা করে' বন্দুক। গাধা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে—হাতে একটা বন্দুক; কুলিতে মোট নিয়ে চলেছে—কাঁধে বন্দুক ঝুলছে। যার দিকেই চোখ পড়ে তার সঙ্গে একটা করে' বন্দুক। মনে হোলো এই ত রাম-রাজত্ব! তা ছাড়া প্রতি দুশো গজ অন্তর রাস্তার দুধারেই এক এক জন করে' পাঠান বসে' রয়েছে। প্রাত্যকের হাতেই রাইফেল। এদের বলে 'পিকেট'। চুপ করে' কোনো শত্রুর প্রতি লক্ষ্য রেখে দিনরাত এমনি রাইফেল্ সঙ্গে নিয়ে বসে' থাকাই এদের চাকরী!

বেলা বোধকরি সাড় ন'টা হবে। এবার বেশ পরিষ্কার রোদ উঠেছে। রোদের গরমে ঠাণ্ডা বাতাসটি এবার বেশ মধুর লাগছিল। মোটরের প্রাণবেগ বেড়েছে কিন্তু উঁচুতে উঠতে গিয়ে গতি কমে' এসেছে। পাহাড় এখানে ক্রমশঃ উর্দ্ধায়মান নয়, একবারে খাড়াই। দুধারে সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে গোলক ধাঁধাঁর মতো কোনো একটা বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেছে। নিতান্ত কিনারা দিয়ে মোটর চলছে, নীচে অনেক দূরে উপলাকীর্ণ চওড়া পথ। অনেকটা শুক্‌নো পাহাড়ি নদীর মতো। ওইটাই বোধ করি পুরাতন খাইবার-পথ। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এবং ঝড় বৃষ্টির দিনে নিরাপদ পথ না থাকায় আমাদের এই নূতন রাস্তাটি তৈরী হয়েছে। কিন্তু এরই ভিতর রেলপথের কল্পনাটি অতি অপূর্ব্ব! সমতল ভূমি থেকে সোজা প্রায় হাজার ফিট উঁচুতে এক অতি আশ্চর্য্য কৌশলে রেলপথ উঠে এসেছে। এর জন্য তাকে যে কত অগণ্য সুড়ঙ্গ পথ কাটিয়ে আসতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই! খাইবার রেলপথ এবং অসংখ্য সুড়ঙ্গ-পথ হচ্ছে সীমান্ত প্রদেশের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি! তাই ত মনে হয়।

মনে হয় সে-কালের শিল্পীরা বানিয়েছে তাজমহল আর আর একালের বৈজ্ঞানিকেরা—খাইবার রেলপথ।

মোটর ছুটছে। রাস্তা কখনো সঙ্কীর্ণ কখনো কিঞ্চিৎ প্রশস্ত। দুধারে তেমনি রুক্ষ অনুর্ব্বর ভীষণাকার পর্ব্বত শ্রেণী। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দুটোর একটাও এদিকে নেই। কাবুল আর পেশাওয়ারের মাঝামাঝি এই বিশাল পার্ব্বত্য প্রদেশে কোন ফসলই ফলে না। ক্ষুধার খাদ্য নেই, তৃষ্ণার জল নেই, বিপন্নের আশ্রয় নেই। কোন পথিকের দেখা মেলে না; কারণ, শত্রুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে কোন পথিক এ-পথে হেঁটে যেতে পারে না! সারাদিনের মধ্যে ক্বচিৎ এক আধখানা মোটর গাড়ী বায়ুবেগে পার হয়ে যায় মাত্র। আর যায় শ্রেণীবদ্ধ উটের দল। সঙ্গে যায় লোকলস্কর। উটের পিঠে ঘেরাটোপের মধ্যে কালো আবরণের আড়ালে কাবুলি বধূর সুন্দর আরক্ত মুখ মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। সুর্ম্মাটানা বড় বড় কালো চোখ, আনিতম্বলম্বিত ঘনকৃষ্ণ বেণী, সুদৃঢ় সুপুষ্ট অথচ সুকোমল দেহকান্তি, ডালিম ফুলের মত রাঙা ওষ্ঠাধর, মুক্তাপাঁতির মতো দাঁত! রাঙা দুখানি পায়ে জরির কাজ করা চপ্‌লি। মুসলমান-রমণী-সুলভ এরা শালোয়ারের উপর পাঞ্জাবী ব্যবহার করে কিন্তু তার উপর উত্তরীয় বড় একটা ব্যবহার করে না। কালো একটা আলোয়ান সর্ব্বদা কাঁধের উপর ফেলে রাখে। বিশেষ করে' রঙটা কালো কেন—তার একটা কৈফিয়ৎ আছে। দূর থেকে কোনো অপরিচিত পুরুষ কাছাকাছি এলে তার লুব্ধ দৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য এরা তাড়াতাড়ি নিজেদের সর্ব্বাঙ্গে এবং মুখের আধখানায় ও মাথায় কালো আবরণ

টেনে দেয়। শুধু চোখের দিকে তাকালে বয়স ঠাহর করা যায় না। এই নাকি এদের আত্মরক্ষার একটি মস্ত উপায়।

মোটর ছুট্‌ছে। উপরে রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশ, আর তারই নীচে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ছোট এক একটি ঘর বেঁধে এক এক জন পিকেট্ বসে'। নীচে পাহাড়ের গোড়ায় গোড়ায় অসংখ্য গুহার ছিদ্রপথ। গুহার মধ্যে নাকি বন্য পাহাড়িরা বাস করে। এরা চিরদরিদ্র কিন্তু চিরকাল স্বাধীন। লুটতরাজ এদের পেশা, নরহত্যা এদের অবলম্বন! প্রাণ দেওয়া এবং প্রাণ নেওয়া এরা ছেলে-খেলা মনে করে। বিগত দেড়শত বৎসরের ইতিহাসে এরা কোনোদিন ইংরাজের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেনি। অথচ তার জন্য অবর্ণনীয় হত্যালীলা হয়ে গেছে, অগণিত লোকালয় ধ্বংস হয়েছে, অপরিমিত অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে—তবুও না। এদের সমাজ নেই--পরস্পর বিছিন্ন, পুরুষানুক্রমে দারিদ্র্য নিবারণের কোনো চেষ্টাই এরা করে না—এমন কি এরা বাসোপযোগী একখানি ঘরও বাঁধে না। আশ্চর্য্য এই জাতি! সমস্ত সীমান্ত প্রদেশকে এরা চিরকালের জন্য রহস্যময় করে' রেখেছে। এদের এই বন্যতা, পাশবিকতা ও হৃদয়হীনতা কোনোদিন সভ্যতার ছদ্মবেশ প'রে জগতের মন ভোলায়নি। অর্থাৎ এরা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রাণরক্ষার দায়ে পড়ে' অর্থশালী মহাজনের টুঁটি টিপে ধরে, অর্থ না দিলে হত্যা করে; স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দেয়।

গাড়ী ছুটছে। পাশেই রেলপথের আঁকাবাঁকা গতি খাইবার গিরিপথের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পথের আশে পাশে বন্দুকধারী আফ্রীদীদের দেখা গেল। এই মাঠে তারা অবাধে বিচরণ করে' বেড়ায়। এ তাদেরই রাজ্য। মাদ্রাজী যুবকটি বলতে লাগলো, আফ্রীদীরা

দরিদ্র, অশিক্ষিত ও সভ্যতালেশহীন। আশে পাশের দুর্গম পর্ব্বত-মালার কোটরে তাদের আবাস, সেখানে তাদের অন্নের সংস্থান নেই, অর্থ নেই, সমাজবিধি নেই। তারা নিষ্ঠুর কিন্তু অসাধু নয়। তারা হাসিমুখে লুণ্ঠন করে—লুণ্ঠন করে শুধু উদারান্ন সংগ্রহের জন্য—এবং অবলীলাক্রমে হত্যা করে ও হত হয়। নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি হ'লে অনায়াসে তারা গুলী ছোড়াছুড়ি করে। পথে ঘাটে দিনমজুরী করে' তারা যা উপার্জ্জন করে তাই দিয়ে তারা কেনে গম, ফল, বাদাম ও বন্দুক। ভারত সরকার সম্ভবত আপন অর্থব্যয়ে তাদের পঠন-পাঠন, সভ্যতা বিস্তার, ও তাদের শান্ত রাখার অভিপ্রায়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি খুলে দিয়েছেন। সেটি খাজুড়ী মাঠের উপরেই সুবিখ্যাত ইস্‌লামিয়া কলেজ, তার কথা আগে বলেছি। ইংরেজি, উর্দ্দু, ফারসী, আরবী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। সশস্ত্র সৈন্য-প্রহরী জামরুদ দুর্গের তত্ত্বাবধানে এই কলেজটির মধ্যে রীতি নীতি ও শাসন বজায় রাখে।

তার পর জামরুদ। পেশাওয়ার থেকে খাইবার-পথের মাঝখানে জামরুদই একটিমাত্র দুর্গ। কেল্লাটি ছোট, ওদেশের পাথর-মিশানো শক্ত মাটির তৈরী। দুর্গম প্রান্তরের মধ্যে এক জটাজুটধারী বল্কল-পরা সন্ন্যাসী চোখ বুজে যেন ধ্যানে বসে রয়েছে। গাড়ী থামল, পথের উপর নেমে একটুখানি পায়চারি ক'রে নিলাম। আপেল্, নাসপাতি ও বাদাম এক জায়গায় অতি সস্তা দরে বিক্রি হচ্ছে। সবাই আমরা যেন আফ্রীদীর ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত; বেশ অনুভব করছিলাম পথের যাত্রীরা প্রতি মুহূর্ত্তেই লুণ্ঠন ও প্রহারের আশঙ্কা করে' থাকে। পথের প্রান্তে মাঠের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে আফ্রীদী নিতান্ত অবজ্ঞা ও

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বৃটিশ প্রজা আমাদের দিকে তাকিয়ে চলেছে। তাদের ভঙ্গী দেখেই মনে হয় তারা স্বাধীন। পেশাওয়ার থেকে লাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত খাইবার গিরিপথের ভিতর দিয়ে সম্প্রতি যে বিচিত্র রেলপথ নির্ম্মিত হয়েছে, সেই রেলপথে আফ্রীদীরা অবাধে ভ্রমণ করে' বেড়ায়। ট্রেণের টিকিট করার বদ্ অভ্যাস তাদের নেই, টিকিট কেউ তাদের কাছে জোরের সঙ্গে চাইতেও সাহস করে না। প্রতিক্ষণে তাদের হাতে টোটাভরা বন্দুক দেখে কোন্ দুঃসাহসী টিকিট-চেকার তাদের কাছে এগোবে? ভারত সরকার এদের অত্যন্ত ভয় করে' চলেন—এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। গাড়ী আবার ছাড়লো। জামরুদ পার হয়ে কিছুদূর গিয়ে আমরা বাঁ-দিকে বাঁক নিলাম। এই পথ বরাবর গিরিগর্ভের মধ্যে চলে গেছে। ইতিহাস বলে, ভারতের বিপুল ধনভাণ্ডার যুগে যুগে এই সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরে' নিরুদ্দেশ হয়েছে! আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল।

কোটি কোটি টাকা খরচ করেও মানুষ যে কাজ করতে সক্ষম হ'ত না, প্রকৃতি সে-কাজ অতি সহজেই সম্পন্ন করে' রেখেছে। দুস্তর এবং দুরতিক্রম্য পর্ব্বত-মালার জটিলতার মধ্যে যে-যাত্রীর দল এই সঙ্কীর্ণ সহজ পথটি প্রথম আবিষ্কার করেছিল, যুগে যুগে তারা শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। দুই পাশের পাহাড়গুলির দিকে তাকালে চোখ জ্বালা করে' আসে,—শস্য ও বৃক্ষলেশহীন, গুল্মলতাশূন্য রুক্ষ, অগম্য ও দুরারোহ। কোথাও তার স্নেহ নেই, ছায়া নেই, সৌন্দর্য্যরূপ নেই। আপন দৈন্য ও রিক্ততা নিয়ে আকাশকে সে প্রতিনিয়ত বিদ্রূপ করছে; প্রকৃতির মায়া-মমতাকে সে যেন নিঃশেষে লেহন করে' নিয়েছে। পাহাড়গুলির কোলে অসংখ্য ছিদ্রপথ, এই ছিদ্রপথগুলিতে নাকি আফ্রীদীরা পাহাড়ের

গোপন স্থানসমূহে যাতায়াত করে। শত্রুর আক্রমণকে এড়াবার নাকি এমন সুবিধা আর নেই। যে পথে আমরা চলেছি তার দুই পাশে হয় পাহাড়, নয় ত একধারে অনুর্ব্বর খানিকটা মাঠ—মাঠের পারে আবার পাহাড়। এই মাঠ এবং পাহাড় সম্পূর্ণ আফ্রীদীগণের অধীনে। মাঠের মাঝে মাঝে তাদের গ্রাম। গ্রামগুলি প্রাচীর-বেষ্টিত। মাঝখানে একটি করে' গম্বুজ। এই গম্বুজের চূড়ায় দিবারাত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকে, তারাই বহিঃশত্রুকে পাহারা দেয়। গ্রামগুলি ও প্রাচীর সমস্তই পাথর-মিশানো মাটির তৈরী। সাধারণ ভাষায় তাদের 'মাটীর কেল্লা' বলা যেতে পারে। যেতে যেতে পথের মাঝখানে এক শ্রেণীবদ্ধ উটের দল পার হলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ,—ঘূর্ণী বাতাস মাঝে মাঝে পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে' চলেছে। উটের গলার ঘণ্টার টুং টাং শব্দ চারিদিকের নির্জ্জনতাকে গভীর ও উদাস করে' তুলছে। সুমধুর ও সুনিবিড় জনবিরলতা। উটের পিঠে ঘেরা-টোপের মধ্যে কাবুলি মেয়েরা ঘোমটা তুলে' পথের দিকে তাকিয়ে চলেছে। সেই সুন্দর আরক্ত মুখ, সুর্ম্মাটানা কালো চোখ, দীর্ঘলম্বিত ঘনকৃষ্ণ বেণী।

ভাবতে ভাবতে চলেছি। কতক্ষণ পরে শাগাই (Shagai) কেল্লা দেখা দিল। সুউচ্চ লাল প্রাচীরে ঘেরা বিরাট দুর্গ। অনেকটা আগ্রার ফোর্টের মতো। দূরে থেকে শাগাই এক অপরূপ দৃশ্য। যতটা রাস্তা এসেছি এর মধ্যে এত বড় দুর্গ আর দেখিনি। উপরে নীল আকাশ, নীচে পর্ব্বতবেষ্টিত সুবিশাল প্রান্তর আর তারই মাঝখানে প্রকাণ্ড রাঙা দুর্গ। তোরণের উপর ইংরাজি হরফে লেখা—শাগাই। দুইজন সশস্ত্র পদাতিক দ্বারে পদচারণা করছে। দুর্গটিকে কেন্দ্র করে' মানুষের অন্তরের পাশবিকতা যেন হিংস্র নখর বার করে' শিকারের আশায় বসে'

আছে। অথচ শত্রুর চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই। ইংরেজের সামরিক সভ্যতার মূল এবং মহামন্ত্রই হচ্ছে এই যে, সাবধানে বিনাশ নাস্তি। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্বন্ধ চলে' গেলেই একটা অকারণ ভীতির সম্বন্ধ তাকে ঘিরে বসে। পৌরুষ যেখানে বিকৃত হয়েছে অতি-সতর্কতা সেইখানেই প্রশ্রয় পায়। শক্তিশালী জাতির অস্ত্র-সঞ্চয়ের এইটিই মর্ম্মকথা।

কয়েক মিনিট থেমে আবার মোটর চলতে লাগল। ঢেউ খেলানো আঁকা বাঁকা রাস্তা। রাস্তাটি কিন্তু ভাল—মোটরে যাবার ভারি সুবিধা। যতদূর চলেছি সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিকের ঊষর পর্ব্বতশ্রেণী যেমন নিস্তেজ তেমনি মাধুর্য্যহীন। পথিকের দৃষ্টির পক্ষে তারা যেন নিতান্তই বাধা। কাঁটা ফুলের মালা গলায় পরে' ক্ষুৎপীড়িত দরিদ্রের মতো তৃষ্ণায় মুখ্যব্যাদান করে বসে' রয়েছে।

পেশাওয়ার ও লাণ্ডিকোটালের মাঝখানে 'শাগাই' হচ্ছে সব চেয়ে বড় দুর্গ। অন্তত পাঁচ হাজার সৈন্য এখানে অনায়াসে বসবাস করতে পারে। শাগাইয়ের কাছে এসে রাস্তাটা অনেকখানি চওড়া ও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। অনেক দূর গিয়ে দুটি পথই আবার একত্রে মেশে।

শাগাই পার হয়ে পথ ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে। এ পথটি নতুন। পুরাতন যুগের পথটি নতুন পথের পাশেই—সে-পথ এখন অগম্য। রেলপথের পাশে টেলিগ্রাফের তারের মতো সেই পথে লোহার খুঁটির মাথার উপর দিয়ে 'রজ্জুপথ' চলে গেছে। এই দড়ির কৌশলে বহুদূর থেকে মালপত্র এবং সংবাদাদি সরবরাহ করা যেতে পারে। এর নির্ম্মাণ-কৌশল অতি বিচিত্র। পথে যেতে যেতে ডান্‌দিকে মাঝে মাঝে খাইবার রেলপথ নজরে পড়ে। অসংখ্য সুড়ঙ্গ-পথের ভিতর দিয়ে যেভাবে ট্রেণ

আনাগোনা করে তা দেখে বাস্তবিকই বিস্মিত হ'তে হয়। এই দুর্গম দেশে গ্রীষ্ম ও শীত ছাড়া আর কোনো ঋতু আসে না। বর্ষার বৃষ্টি এখানে দাঁড়াবার জায়গা না পেয়ে করুণ চক্ষে ফিরে যায়। যেটুকু জল পড়ে তা'তে পথ পিছল ও বিপজ্জনক হয়, গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়। শীত এদিকে প্রবল।

সমস্ত পথটাই যে একটি সন্ত্রস্ত আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল সে কথা আজো ভুলিনি। দুই চোখের নিস্পলক দৃষ্টি চারিদিকে সজাগ করে' স্থাণুর মতো বসে' ছিলাম, হাতের দড়িটা দৃঢ় মুষ্টিতে বাগিয়ে ধরেছি। প্রাণঘাতক শত্রু-পরিবেষ্টিত পথ মানুষ কিরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে পার হয়? মনে হচ্ছিল অলক্ষ্যে এই কাছাকাছি কোথাও ভয়ানক একটা রণসজ্জা চল্‌ছে। চারিদিক থেকে একটা মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে আর দেরী নেই। কামান উঠ্‌ল গর্জ্জন করে', রেলপথ হোলো বন্ধ, আকাশে উঠ্‌ল উড়ো জাহাজ, তারপর বোমা, এই সরল পার্ব্বত্য-জাতি অসভ্য কিন্তু আমাদের শত্রু নয়, অন্নের অভাব তাহাদের হৃদয়হীন করেছে, কিন্তু তারা মনুষ্যত্বহীন নয়; তারা বর্ব্বর, মনুষ্য সমাজের অযোগ্য, শিক্ষাহীনতায় পঙ্গু—কিন্তু পরাধীনতার দুঃসহ আত্মগ্লানি তাদের নেই, তারা স্বাধীন জাতি। তারা যুদ্ধে মরে, আহত হয়, উপবাস করে, তবু তারা কোহাট ও কান্দাহারের দরজায় দাঁড়িয়ে বন্দুক কিনে এনে আপন স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। উপবাসখিন্ন কণ্ঠে তা'রা গজলের সুর ভেঁজে বেড়ায়। লাণ্ডিকোটালের তাঁবু পর্য্যন্ত আসতে আসতে শুধু এই কথাই আমার বার বার মনে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে সহসা এক সময় যাত্রীগুলি যেন সজাগ হয়ে উঠলো। গাড়ীর গতি একটু মৃদু হতেই দুজন সশস্ত্র পুলিশ লাফিয়ে ভিতরে

ঢুকলো! আমরা যে কোন্ জাতের লোক তা একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার বৈ কি! চুপ করে' রইলাম, গোয়েন্দা-সুলভ দৃষ্টিতে তারা বারম্বার তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে' রইল। লাণ্ডিকোটাল যখন দেখা দিল, বেলা বোধকরি তখন এগারোটা হবে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে দূরে একখানি ক্ষুদ্র শহর দেখা গেল। মনে হোলো শিল্পীর হাতে আঁকা একখানি চমৎকার ছোট্ট ছবি। তাসের ঘরের মতো গোরা-সৈন্যরা কুচ্‌কাওয়াজ করছে, কেউ কেউ বা ঘোড়ার পিঠের উপর চ'ড়ে ছুটছে। ছোট্ট একটি স্বপ্ন যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে!

লাণ্ডিকোটালে এসে গাড়ী থাম্‌ল। আর গাড়ী যাবে না। লাণ্ডি-কোটালকে একটি অতি ক্ষুদ্র অস্থায়ী শহর বলা যেতে পারে। পথের দুই ধারে চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট সৈন্যাবাস। পথের উপরে দাঁড়ালে নীচে একখানি সুন্দর ছবির মতো শহরটি দেখা যায়। এখানে একদিকে কেবল পাহাড়শ্রেণী আর তিন দিকে প্রান্তর। সেই বিশাল প্রান্তর ভারত-সরকারের এলাকাভুক্ত নয়। এদিকে একটি গাছ নেই, একটি দূর্ব্বাঘাসও নেই। রুক্ষ ও অকরুণ পাহাড়গুলি কয়লার ঘেঁসের মতো কালো ও বিবর্ণ। কেবলই মনে হয় এর চেয়ে মরুভূমিও মানুষের গতির সহায়তা করে। নারী ও শিশুকে এদিকে আনা আইনবিরুদ্ধ। প্রথমে নেমেই শুনলাম, দিন চারেক আগে এখানে কোথাও অফিসঘরের ভিতর থেকে একটি সৈনিক যুবক চুরি হয়ে গেছে, যুবকের আর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এ কাজ নাকি আফ্রীদীদের। ভয়ে ভয়ে তারের বেড়া পার হয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি বাঙালীর সন্ধান মিলল। এত দূরে 'দেশওয়ালীকে' পেয়ে পরম তৃপ্তি অনুভব করলাম। কাঙাল যেন

পথের ধারে মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছে! মুহূর্ত্তেই গভীর পরিচয় হোলো। তিনি এখানে সুড়ঙ্গপথ নির্ম্মাণের কাজে এসেছেন। মিঃ ঘোষ বলে' তাঁর এদিকে পরিচয়। আর একটি লোকের সঙ্গেও আলাপ হলো, তাঁর নাম মিশিরজি। তাঁর বাড়ী আগ্রা জেলায় সুতরাং বাংলার প্রতিবেশী বলা চলে। তিনি পরমানন্দে যুদ্ধের গল্প শুরু করলেন।

এত দূরে বাঙালীর ছেলে পেয়ে পরমানন্দে সময়টুকু কাটতে লাগল। সহস্র বিরোধ এবং চারিদিকের এই অকরুণ আবহাওয়ার মধ্যে বাঙালীর এই কেন্দ্রটি কেমন যেন মৃদু কোমল! নির্ম্মম বর্ব্বরতার মধ্যে যেন একটু হৃদয়ের ছোঁয়াচ এখানে ধুক্ ধুক্ করছে।

—এই যে দেখছেন সামনে তারের বেড়া ওই পাহাড় অবধি উঠে গেছে, ওই অবধি আমাদের সীমানা; বেলা চারটের পরে পেরি-মিটারের বাইরে গেলেই একেবারে বেওয়ারিশ মাল; বিপদ ঘটলে দাদ-ফোরেদ নেই! গভর্ণমেণ্ট থেকে আমাদের সাবধান ক'রে দেওয়া আছে!—ছোকরাটি বলতে লাগল।

ঘুরে ঘেড়িয়ে বেড়িয়ে গল্প চলছিল। শীতকালের অবারিত রোদটুকু ভারি মিষ্টি লাগছে! যতদূর দৃষ্টি চলে চারিদিক যেন এক অখণ্ড বিস্ময়! কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাবো, কিছুই আর মনে ছিল না! মনে হচ্ছিল যে পথে এসেছি এই পথ গেছে আফগানে, রুশিয়ায়, ইউরোপে, তুর্কীতে! এ-পথ পৃথিবীর সকল পথের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে!

লাণ্ডিখানায় যাবার অনেক উপায় আবিষ্কৃত হলো বটে কিন্তু সাহসে কুলালো না। ভয় করে' চলে, আমাদের মন এমনি পঙ্গু হয়ে গেছে যে দুঃসাহসের ভূমিকাতেই আমরা মনে করি যেন অনেকখানি এগিয়ে গেছি। আমাদের পাঁচিলঘেরা সাধারণ জীবনে যদি কোথাও একটু চিড়

খেয়ে যায় ত অমনি আমাদের অশান্তির আর অন্ত থাকে না। দুঃসাহস কোথাও দেখাবার সাহস চুলোয় যাক্—বাঙালী জাতি ভীরু, এই কথাটাকে মিথ্যা প্রমাণ করবার সাহসও আমরা হারিয়ে বসে' আছি।

খাওয়া দাওয়ার পর এদিক ওদিক ঘুরে একটু আধটু দেখা ছাড়া আর কোনো সুবিধা ছিল না। ছোকরাটি বল্‌লে—বেলা তিনটেয় গাড়ী মশাই, যেন ফেল্ করবেন না! যাবার সময় ট্রেনেই যান্—অনেক সিনারি দেখতে পাবেন।

বললাম—আচ্ছা চারিদিকে যে এমন তোড়জোড় আর সাজ সাজ রব দেখতে পা'চ্ছি, ব্যাপার কি বলতে পারেন? যুদ্ধ বাধ্‌বে নাকি?

ছোকরাটি একটু হাসলো। বল্‌লো—জানেন না বুঝি?

আজ্ঞে না, এদের ব্যাপার দেবাঃ ন জানন্তি।

সাবধানের বিনাশ নেই মশাই! যে দুজন বাঙালী আছি—এর মধ্যে ক'বার এসে আমাদের ইন্‌স্‌পেক্ট করে' গেছে! লাহোরে রাজদ্রোহী বাঙালীর দল ধরা পড়েছে, শোনেন নি? কাশীতে আর বম্বের বোম্বার্ডমেণ্ট?

একি সবই বাঙালীর কাণ্ড?

ওরা ত তাই মনে করে!

বললাম—তা এখানে মাত্র দুটি মশা, এখানে এখন কামান দাগা কেন?

গল্প করতে করতে বেরোলাম। সঙ্গে আর একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক জুটলেন। এঁর বাড়ী ডেরাডুনে। চাকরী নিয়ে এতদূরে এসেছেন। চাকরীটি এমন যে, তিনি নাকি বদ্‌লী হয়ে নিজের মুলুকে চলে' যেতে পারতেন কিন্তু তা যাননি। এমন সব বিপদের

সম্ভাবনা মাথার উপর নিয়ে কেন যে তিনি এই সুদূর নির্ব্বাসন বরণ করে' নিয়েছেন—সে সংবাদ অনেকেই জানে না। ভদ্রলোকটি সদালাপী, আমুদে, অবিবাহিত এবং সুপুরুষ। তাঁর ভদ্র ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছিল, দেশে এবার ফিরেই ভাল করে' উর্দ্দু ভাষাটা দুরস্ত করে' নিতে হবে। তাঁর এই ধরণের জীবন যাপনের গোপন কথাটি জানেন এই বাঙালী ছোকরাটি।

সূর্য্যদেব তখন একটু পশ্চিম দিকে হেলছেন। একে একে সব ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করা গেল। কোন্ কলকাঠিটি নাড়লে কি হয় কিছুই বুঝলাম না—শুধু চোখ দিয়ে দেখে যেতে লাগলাম। ধুতি পরা বাঙালীর দিকে চারিদিকের কৌতূহলী দৃষ্টি হাঁ করে' চেয়ে রইল। নিজের মূল্য যে এতখানি এর আগে জানতাম না। দেখতে দেখতে আরও গুটিতিনেক সঙ্গী জুটে গেল এবং প্রত্যেকের অল্প বিস্তর সঞ্চিত সংবাদ একে একে আমার কানের মধ্যে জমা হতে লাগ্ল। তার মধ্যে সেই একই একঘেয়ে যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন, নরনারী হরণ, শত্রুর ফন্দী-ফিকির, এবং পথচারীদের নানা বিপদআপদের কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতার ইতিহাস শুনতে শুনতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম।

সকলে মিলে পেরিমিটারের বাইরে এলাম। মাঝে মাঝে একটি পাহাড়ী পাঠান পথিক পার হয়ে চলেছে। আড়ে আড়ে আমাদের দিকে যে কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' যাচ্ছে এ যেন আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম।

শীতের শুক্‌নো হাওয়ায় রোদ ভারি মধুর লাগছিল। পরিচয়হীন ও অজ্ঞাতকুলশীল বন্ধুগণের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের মতো গভীর

ভাবে গল্প চলছিল। রাক্ষসপুরীর মধ্যে রাজকন্যার যেমন অবস্থা, চারিদিকে পর্ব্বতে-প্রান্তরে আফ্রীদীগণের মাঝখানে এই সুন্দর ও মনোরম লাণ্ডিকোটাল শহরটিরও সেই অবস্থা। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা না থাকায় এ স্থান যেন অঙ্গহীন ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অন্তরে অন্তরে এ যেন শ্রীহীন। সমাজের জীবন-ধারণের পক্ষে নারীর প্রয়োজন যে কতখানি, এর আগে এমন করে' আর কোথাও অনুভব করিনি। খাইবার-পথ অতিক্রম করে' যে বস্তুটি সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করা যায় তা হচ্ছে প্রকৃতির বিদ্রূপ, অনাত্মীয়তা, অপরিমিত কর্কশতা—যেন একখণ্ড তৃষ্ণার্ত্ত ভূমিখণ্ড সমগ্র পৃথিবীর কারুণ্য ও দাক্ষিণ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে নিরন্তর আকাশের দিকে তাকিয়ে হা হা করছে। দরিদ্র শুধু নয়,—দেউলিয়া!

পথের নীচেই একটি সরাইখানা। এ সরাইখানা জনসাধারণের জন্য নয়। দূর আফগানিস্থান থেকে যে-যাত্রীরা ভারত-অভিমুখে রওনা হয়, এখানে তারা বিশ্রাম করে। বিশ্রাম এবং বিশ্রম্ভালাপ। ভিতরে একদল উট, অসংখ্য মুরগী, কোথাও বা আগুন জ্বালিয়ে বাছুর এবং ভেড়া পোড়ানো হচ্ছে, কোথাও কোনো যুবক-যুবতী একান্তে হেসে হেসে গল্প করছে, কোথাও বা প্রকাণ্ড গড়গড়ায় তামাক ও গাঁজা সেজে একদল কাবুলী নরনারীর জটলা বসেছে। সরাইখানার দরজায় সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত। ভারতবাসীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। অন্য দিকে দলে দলে গোরাসৈন্যের কুচ্-কাওয়াজ চলছে, কোথাও থেকে-থেকে বাঁশী বেজে উঠ্‌ছে—কোনো কোনো তাঁবুর চারিদিকে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে' গেছে। সাজসজ্জা,

আভাস-ইঙ্গিত, জরুরী আনাগোনা, চুপি চুপি কথা, বন্দুক রাখার ছপাছপ্ শব্দ,—মাথা যেন খারাপ হয়ে যায়।

মনে হোলো, ছায়াচিত্র দেখছি। আরব দেশের কোনো নগণ্য দরিদ্র ভগ্ন পল্লীর কাছে দাঁড়িয়ে আছি। সেই উটের দল, সেই নোংরা ও শতছিন্ন পাগড়ী ও পায়জামা পরা পাঠান, সেই বোর্খা পরা বিদেশী বধূ। কেউ মুরগী কাটছে, কেউ উনুনে মাংস রাঁধছে, কেউ রুটি বানাচ্ছে, কেউ কেউ বা সঙ্গীদের নিয়ে বসে গাঁজা-তামাক টানছে। ছেলেমেয়েগুলো ভেড়া-বক্‌রি নিয়ে খেলা করছে, আবার কোনো যুবক যুবতী বা একটু চোখের আড়ালে গিয়ে পরস্পর হাসাহাসি করছে। এই ত ছবি, এই ত একটি সমগ্র রূপ! যাত্রীরা নানা বিভিন্ন দল বেঁধে পথে পথে চলে—শুনলাম এক দলের কোনো পুরুষ এবং আর এক দলের কোনো নারীর মধ্যে মাঝে মাঝে চমৎকার প্রেমের ঘটনাও ঘটে যায়। এবং এমন ঘটনা ঘটলে অনেক সময় যুবক-যুবতী দল ছাড়া হয়ে গিয়ে নিজ নিজ পথ আবিষ্কার করতে থাকে। এদের প্রেম সুস্থ এবং সবল। প্রেম এদের জীবনকে অকর্ম্মণ্য করে না, মোহগ্রস্ত করে না—বরং নব নব জীবন-সংগ্রামের পথে এদের চালিত করে।

এমন সময় চারিদিকে একটা অস্ফুট গোলমাল শোনা গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে পিছন ফিরে এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, অন্তত একশত সশস্ত্র গোরাসৈন্য পুতুলের সারির মতো সকল জায়গায় ছড়িয়ে গেছে।

ব্যাপার কি!

সাইমন সায়েব আসছেন।

আমরা সবাই বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেষশাবকদের মধ্যে বাঘের আগমনবার্ত্তা প্রচারিত হ'লে তাদের যে অবস্থা হয়—বল্‌তে নেই, আমাদেরও ঠিক তেমনি। বিদেশে বিভুঁয়ে রাজ-অতিথিকে অসম্মান দেখাতে গিয়ে ত আর বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে মরতে পারিনে! এখানে আমাদের ধ'রে রাজবংশীয়েরা যদি জলজ্যান্ত সমাধিস্থ করে ত দশ বছরের মধ্যেও দেশে সংবাদ পৌঁছাবে না। ঝুট্‌-মুট্ বাচালতা দেখিয়ে কি প্রাণ হারাবো?

ওই যে মোটর দেখা গেছে!

একখানা ত নয়—সবশুদ্ধ সাতখানা মোটর!

এক, দুই, তিন, চার—বিদ্যুতের মতো চারখানা মোটর পার হয়ে গেল!

পঞ্চমখানাই বটে। হাঁ, ওই যে ওখানার মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়চে। নীল রংয়ের মোটর!

দেখতে দেখতে আকাশ পাতাল ধুলোয় ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল। আগন্তুকের সম্মানের চিহ্নস্বরূপ অদূরে কামানের একটা আওয়াজ করা হোলো। আকাশে ভগবান পর্য্যন্ত তাতে ভয় পেয়ে গেলেন!

কথায় কথায় লাণ্ডিখানার কথা উঠ্‌ল, লাণ্ডিখানাই ভারতের শেষ সীমা। শোনা গেল কোনো 'বাঙ্গালীর' সেখানে যাওয়া নিষেধ,—কেন, সে কথার উল্লেখের আর প্রয়োজন নেই। লাণ্ডিখানা এখান থেকে মাত্র চার মাইল দূর। সেখানেও দুর্গ নেই, গুটিকয়েক কেবল তাঁবুর সমষ্টি। রেলপথটি তার ধারে গিয়েই ফুরিয়ে গেছে। ট্রেণ সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করে না,—শুধু প্রয়োজনের সময়ে।

বৃটিশ সীমাটি আফগান সীমানা থেকে অতি ছেলেমানুষী উপায়ে চিহ্নিত করা। এ যেন মাত্র একটা মৌখিক বোঝাপাড়া। আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারত সরকারের সদ্ভাব রাখা যেন একটি ভয়ানক সমস্যা। আফগানিস্থানের কর্তৃত্ব এদিকে অত্যন্ত প্রবল ও প্রভাবশালী। আফ্রীদীগণ যদি আফগানের সঙ্গে মিতালী করে' ভারতের সীমানাকে আক্রমণ করে তবে ভীষণ বিপদ! সুতরাং আফগানদের সঙ্গে মিতালি করে, আফ্রীদীগণকে সকলের কু-নজরে রাখতেই হবে—যাক্ সে-কথা। ভারত থেকে মালপত্র আনাগোনার সময়ে এই লাণ্ডিখানায় পরীক্ষা করা হয়। একদিকের লোক নামায়, আর একদিকের লোক তুলে নেয়। এখান থেকে কাবুল পর্য্যন্ত যাবার মোটর-পথ আছে। বৃটিশ সীমানার ধারে একখণ্ড কাঠের উপর লেখা,—'It is absolutely forbidden to cross this border into Afghan territory'.

এইবার শেষের পালা। শীতের সূর্য্য এরই মধ্যে পশ্চিম পথে পাহাড়ের মাথায় নেমেছে। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে আমরা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই স্যার জন্ সাইমনের মোটর বিদ্যুদ্বেগে ক্যাম্পের ধারে এসে দাঁড়ালো। রাজা এলেন, পিছনে পিছনে আরো ছ'খানি মোটর এল। রাজকীয় অভ্যর্থনার কায়দায় তাঁকে গৌরব-গর্ব্বিত করা হ'ল। সবাই এল ছুটে, আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তারের বেড়ার বাইরে দু'একজন আফ্রীদী দেখে দেখে চলে' যাচ্ছিল। তাঁবুগুলি থেকে সৈন্য ও সিপাহীগণ সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এসে ব্যূহ-রচনা করে' দাঁড়ালো। সবাই পথে নেমে এসে যোগ দিল এই অভ্যর্থনায়, বাকী আর কেউ রইল না।

অদূরে একটি দরজায় নজর পড়তেই দেখলাম একটি তরুণবয়স্ক

সুশ্রী ইংরাজ যুবক গলা বাড়িয়ে চুপি চুপি সাইমন্-সমারোহ লক্ষ্য করছে। আয়ত দু'টি চোখ - কিন্তু সে-চোখ চকিত চঞ্চল, কৌতূহল ও মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত। অত্যন্ত দ্বিধাজড়িত ত্রস্ত মুখ, সর্ব্বশরীর লুকিয়ে আত্মগোপন করে' কোন মতে উঁকি মেরে সে সমস্তটা দেখে নিতে চায়। তার এই অদ্ভুত চৌর্য্যবৃত্তি দেখে কৌতূহল হোলো। পাশের বন্ধুর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলাম। বন্ধুরা বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, আরে, ওকে ত আমরা জানি, সে এক ভারি মজা। চলুন, এবার এগোই।

চিন্তিত মুখে তাঁদের সঙ্গে চললাম। ফেরবার সময় ট্রেণে যাবার কথা,—ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হলাম। তারের পেরিমিটার পার হলেই লাণ্ডিকোটাল ষ্টেশন্। তরুণ যুবকটির সেই অদ্ভুত আত্ম-গোপনের প্রয়াস দেখে অবধি আমি তার সম্বন্ধে জানবার জন্য উৎসুক ছিলাম। বললাম, মিশিরজি, মজাটা কি শুনি ?

সবাই হাসতে লাগল। সকলেরই হাসির অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলাম। মিশিরজি বললেন, আরে মশাই, বুঝতে পারেননি ? ও ব্যক্তিটি পুরুষ নয় !

পুরুষ নয় ? মানে ?—মুহূর্ত্তে চোখের চারিদিকে সমস্তটা যেন লণ্ডভণ্ড ওলোট-পালট হয়ে গেল, আমার আবারণ উৎসুক দুই চোখ ছুটল সেই ছেলেটির শাদা কোট্ প্যাণ্টের দিকে। সে কি তার ছদ্মবেশ ? কেন ? কেন তার এই বিড়ম্বনা ?

মিশিরজি মাতৃভাষায় জানালেন, সে এক অপূর্ব্ব প্রেমের কাহিনী, সুন্দর ও করুণ ! ও ভারী দুঃখী, তা জানেন ? ও লুকিয়ে পুরুষ সেজে এসে একজনের খবর নিয়ে যায়।

আর কিছু জানবার প্রয়োজন ছিল না, মুখ ফিরিয়ে শুধু দূর প্রান্তরের দিকে একবার তাকালাম। দিন অবসান হয়ে এসেছে। মনে হোলো, কি হবে সে কাহিনী শুনে? বাইরের ঘটনা কি অন্তরের গোপন ফল্গুধারার সন্ধান দেবে? থাক্—ও আমি নিভৃত কল্পনায় আবিষ্কার করে' নেবো।

বন্ধুগণের কাছে বিদায় নিলাম। বললাম, আবার দেখা হবে।

কোথায়? কবে?—সবাই ব'লে উঠ্‌ল। কণ্ঠে তাদের অদ্ভুত ব্যাকুলতা!

বললাম, গ্রহ-তারকার চক্রান্তে!

সবাই বিদায় হাসি হাসলাম। সে-হাসি আমাদের শ্রাবণের প্রভাতের মতো। গাড়ী আস্তে আস্তে ছাড়লো। সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নেই!

১৯৩২ সালের কথা।

জনকয়েক আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম আগ্রায় তাজমহল দেখতে। সেই প্রথম। তাজের মতো জায়গায় কোনো সঙ্গীর সঙ্গে যাওয়া উচিত নয়। অত্যন্ত সহজ সুস্থ মানুষ যে কেমন করে' এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বদ্‌লে যায় তা আমার কতকগুলো ঐতিহাসিক জায়গায় ঘুরে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই ত সেদিনেও দেখলাম, একটি ভদ্র-লোকের ছেলে আগ্রায় এতমদ্দৌলাকে তাজমহল বলে' ভুল করে'

দু'মিনিটের মধ্যে কি কান্নাটাই কাঁদলে! যখন তাকে জানানো হলো এটা তাজমহল নয়, সে তখন চোখ মুছে লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, এটাও কিন্তু তাজের মতন!—বলিহারি!

এবারেও তার ব্যতিক্রম হোলো না। গাড়ী থেকে নেমে ফটকে ঢুকে যখন সুমুখের দিক থেকে তাজ প্রথম দৃশ্যমান হলো, আমার সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে শুরু করলেন। একজন ত' সস্তা হৃদয়োচ্ছ্বাসে ফানুষের মতো ফুলেই উঠলেন! আর একজন কাব্যের অনুকরণে এমন কাঁদুনি জুড়লেন যে স্বয়ং শাজাহানও বোধকরি মমতাজকে হারিয়ে অতখানি ক্ষেদোক্তি করেন নি।

দু'তিনটি মহিলা ছিলেন, তাঁদের সহজেই বোঝা গেল। এক জায়গায় তাঁরা পাশাপাশি বসে' নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাজ-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরা শব্দ করেননি, নিশ্বাস ফেলেননি, উচ্ছ্বসিত হয়ে ছট্‌ফট্‌ করেননি—তাঁদের সহজেই বোঝা গেল। তাঁরা যেন গভীরের মধ্যে ডুবে গেছেন!

তাজের পাথরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখা হয়। একদিকে যমুনা নদী, আর তিনদিকে যে প্রকাণ্ড কেয়ারী করা বাগান রক্ষিত আছে, সে রকম বাগান সহসা কোথাও চোখে পড়ে না। জনকয়েক মুসলমান সরকারী চাকর আছে, তারাই দেখে শোনে, মাইনে পায়। তারাই বংশানুক্রমে তাজের রক্ষী বলে' চলে' আসছে। বখ্‌শিস্ পাবার জন্য তাদের একটি অতিরিক্ত ব্যাকুলতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম ঢুকেই বাঁ-হাতি দোতলায় একটি ম্যুজিয়ম আছে। সেখানে কতকগুলি বিভিন্ন মানচিত্র সাজানো। কিছু কিছু

পুরাণো আমলের দ্রব্য-সামগ্রী সুরক্ষিত রয়েছে। বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে তাজমহলের বিভিন্ন সময়কার চিত্র একটি 'ষ্ট্যাণ্ডের' মধ্যে টাঙানো। কয়েকখানি নবাবী ছবি। তাজকে নিয়েই তার মধ্যে যত আয়োজন।

এখানকার একটি বিশেষত্ব এই, তাজের শ্বেতমন্দির ছাড়া আর যা কিছু সমস্তই লাল পাথরেব তৈরী। লাল মস্‌জিদ্‌, লাল গম্বুজ, লাল পাথরের পথ, লাল পাঁচিল—সবই প্রায় লাল। শ্বেতকায়া সরস্বতী যেন রক্তপদ্মের উপর বসে আছেন—এমন একটি উপমা তাজ সম্বন্ধে ব্যবহার করা চলতে পারে। বহুদিন ধরে' তাজমহল একটু একটু করে' যে ক্ষয় হয়ে চলেছে—তার স্পষ্ট চিহ্ন অনেক জায়গায়ই দেখা যায়। লর্ড কার্জ্জন এজন্য অনেক টাকা খরচের ব্যবস্থা করে' গেছেন। এদেশের ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক স্থানগুলি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তবে তাঁর এদেশে আসবার আগে আমাদের যেটুকু অধিকার ছিল এসবের উপর, এখন আর তার বিন্দুমাত্রও নেই। লর্ড কার্জ্জন একটি আলো উপহার দিয়ে গেছেন তাজমহলকে। আলোটি রয়েছে। তার দাম নাকি চার হাজার টাকা।

তাজ-এর মন্দিরটিকে বহু মূল্যবান পাথর এবং তার উপর বিচিত্র কারিকুরি করে' সৌখিন করবার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। রাজার বিরহ-মন্দির রাজোচিত খরচেই তৈরী হয়েছে। পাথরের উপর আর্টের খেলা ভারতের এমন আর কোথাও নেই। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির কথা এখানে বাদ দেবো। তাজকে উপযুক্ত আহার এবং সংস্কার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে দেশের অনেক টাকা ব্যয় হয়।

একটা সিঁড়ি দিয়ে নামতে এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে পা ছড়ে' কেটে

গেল। সে রক্তপাতটুকু আজো মনে পড়ে। যাই হোক, সঙ্গীগণের হৃদয়াবেগের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে শেষকালে একটু দূরেই সরে যেতে হোলো। সেদিন আকাশটা বেশ পরিষ্কার। সন্ধ্যার সময়েই তাজ-এর মাথার উপর চাঁদের আলো এসে পড়লো। সূর্য্যের নিষ্প্রভ আভা এবং চাঁদের অস্পষ্ট আলো মিলিয়ে তাজটিকে সুন্দর লাগে। যমুনার কল্লোল বিন্দুমাত্রও শোনা যায় না, যারা শুনতে পায়, হয় তাদের কানের রোগ আছে, নয়ত তারা মিথ্যা কথা বলে।

মার্ব্বেল পাথরের একটা বেঞ্চিতে এসে বসলাম। একা নয়, বেঞ্চির আর একধারে একজন অপরিচ্ছন্ন মুসলমান কতকগুলি কাপড়ের ছাঁট্‌কাট্‌ নিয়ে বসে' বিড়ি টান্‌ছিল। বোধ হয় দর্জি। সঙ্গীদের উপর একটি ক্ষুদ্র রোষ আমার মনকে তখন অত্যন্ত তিক্ত করে তুলেছে।

বেড়াতে অনেকেই এসেছিল। মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। নানা জাতের নানা শ্রেণীর মানুষ। সান্ধ্য ভ্রমণের পক্ষে তাজমহলের বাগান অতি আরামদায়ক। সন্ধ্যার অন্ধকারে সবাইকে ভালো দেখাই যায় না।

তখন সবে নূতন টর্চ্চের আলো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দূর থেকে কে একজন টর্চের আলো টিপতে টিপতে এগিয়ে আসছিল। কাছাকাছি আসতেই বোঝা গেল, দুটি স্ত্রী-পুরুষ। পুরুষটি সুপুরুষ, তার স্বাস্থ্যের গৌরবও প্রচুর। মেয়েটি এল পিছুনে পিছনে, এবং তার পিছনে আসছিল প্রকাণ্ড পাগড়ী-মাথায় একজন 'গাইড'। সে এবার বখ্‌শিশ চায়।

কাছেই তারা দাঁড়ালো। তারা যে বাঙালী এবং স্বামী-স্ত্রী তা দেখেই বুঝতে পারলাম। পুরুষটি বল্‌লে, 'বখ্‌শিশ কত?'

"গাইড' আবার সেলাম করে' বিনীত হাসি হাসলো।

'টর্চ্চটা' জ্বালো ত' একবার, খুচ্‌রো পয়সা গুণে দিতে হবে। Eight annas, কেমন ?'

মেয়েটি উত্তরে বল্‌লে, 'Sufficient,'—এই বলে' সে টর্চ্চটা টিপে জ্বেলে তার স্বামীর হাতের উপর ধরলো। তারপরেই আবার একটু হেসে বললে, 'Sorry, ওটা আমার বলে' দেওয়া উচিত নয়। তোমার যা খুসী দাও।'

আলোটা পড়েছিল সুমুখের দিকে কিন্তু তার আভায় দেখলাম মেয়েটির মুখ। বর্ণনা করতে গিয়ে কেমন করে' বলবো যে, সে সুন্দরী! কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য মেয়েটি তার অপরূপ গ্রীবা এদিক ওদিক ফিরিয়ে একবার দেখে নিল; তারপর 'গাইডের' পাশ কাটিয়ে স্বামীর হাত ধরে' সে আবার এগিয়ে চললো। কেন জানিনে তুচ্ছ তাজমহলটা সেই মুহূর্ত্তেই যেন একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেল। তার পথের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রইলাম; দেখতে দেখতে সে অদৃশ্য হোলো, কিন্তু ঘাড় আর ফেরাতে পারলাম না। ইংরেজি কবিতার একটি ছত্র মনে পড়তে লাগলো, 'with longing lingering look behind!'

ঈর্ষা নয়, কামনা নয়, রূপ-পিপাসার আকুলতা নয়,—সমস্তটাতেই মনে হোলো যেন অতীত অপরিজ্ঞাত কোন্ এক পূর্ব্বজন্মে কাকে যেন পিছনের নিশ্চিহ্ন অন্ধকারের পথে ফেলে চলে' এসেছি! মহাকালের অনন্ত প্রবাহ-ধারায় চলেছি প্রাণ থেকে প্রাণে, জীবন থেকে জীবনে, এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে, কিন্তু দেহ-দেহান্তরে ঘুরে ঘুরে পুরুষ যাকে লালায়িত বিরহ বেদনায় খুঁজে বেড়িয়েছে, সে কোন মেয়ে?

মনে হোলো মর্ম্মর মন্দিরের গর্ভ থেকে যে উঠে এসে এইমাত্র চলে' গেল, সে মমতাজ!—মমতাজ সে? সে কি দেখে গেল তার

প্রেমের সম্মান? তার মধ্যে কি ছিল আদিম বিরহ-লোক? হায় রে, যে-বিরহ মৃত্যুর মধ্যে শেষ হয়ে গেল তার মূল্য কি! বিচ্ছেদের বেদনা—সে যে জীবিতের! তাজমহলের আত্মা ততদিন পর্য্যন্ত জাগ্রত ছিল যতদিন সম্রাট্ ছিলেন বেঁচে। নৈলে সে পাথরের স্তূপে, অমরত্বের ব্যঙ্গ!

যে মমতাজ, সে হারায় যুগে যুগে, কালে কালে; যে শাজাহান—সে শুধু হৃদয়-যমুনার তীরে অন্তরের তাজমহলের দিকে তাকিয়ে বিরহের তপস্যা করে। আমরা সবাই শাজাহান, চিরজীবন ধরে' পৃথিবীর পথে-পথে আমরা চিরদুর্লভ মমতাজকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোনো এক বাঁকে কোনো সময় ক্বচিৎ ক্ষণেকের জন্য হয়ত আমরা তার দেখা পাই। নৈলে 'জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই ভুবনের ঘাটে ঘাটে।'

দর্জ্জির হাইতোলার শব্দে অকস্মাৎ আমার চমক ভাঙলো। সমস্ত দেহটা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কি পাপ!

এই পাথরের বেঞ্চিগুলো কি যাদু জানে! এরা মানুষের উপর ভৌতিক ক্রিয়া করে নাকি? যেন একটা ভয়ানক্ নেশা ছেড়ে গেল! তাজ-এর মর্ম্মর সোপানগুলি বহু মানুষের দীর্ঘশ্বাসে ভরা। বহু ব্যর্থ জীবনের সাক্ষী!

কয়েক পা গিয়েই সঙ্গীদের দেখতে পেলাম। বড়বাবু আবেগে, আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ফুলে ফেঁপে বলে' উঠলেন, যে আনন্দ তুমি দিলে ভাই, যা দেখালে এর আর শোধ নেই!

তুমি না চাক্‌রীর চেষ্টা কচ্ছিলে? এবার তাহলে কল্‌কাতা ফিরেই একখানা দরখাস্ত লিখে আমার আপিসে যেয়ো—বুঝলে?

যে আজ্ঞে।

ক্রোশ পাঁচেক মাত্র পথ। ছোট্ট একটি শাখা-লাইন্ মথুরা থেকে এসে শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজীতে বানান্ ভুল ক'রে ষ্টেশনের নাম হয়েছে 'বিন্দ্রাবন'। বৃন্দাবন চিরদিনের ভুলের দেশ!

এবার একা নয়, সঙ্গে বহু তীর্থযাত্রী। ষ্টেশনে যখন নামলাম, তখন বেলা অনেক। জনবিরল চারিদিক সাঁ সাঁ করছিল। নিকটে ও দূরে শীতশেষের শীর্ণ রুক্ষ মাঠ রোদের আলোয় উজ্জ্বল। আকাশ থেকে একটি মন্থর নীল ছায়া নেমে এসেছিল।

তীর্থযাত্রীদের সোরগোল শুরু হোলো! কেউ মাথায় নিল মোটঘাট, কেউ নিল পুঁট্‌লি, জিহ্বায় কেউ তুললো 'পদরজঃ'—কেউ বল্‌লে হরিবোল,—এবং যারা বাকি রইল তারা পাণ্ডাগণের জেরায় ও অপ্রতিহত প্রশ্নস্রোতে হাবুডুবু খেতে লাগলো। দেখতে দেখতে দিকে দিকে একটা সাড়া জেগে উঠলো।

ধুলোয়-ধূলোয় আচ্ছন্ন সামান্য একটুখানি শহর। পথ বেশি দূর নয়। কোলাহল করে' ধুলো উড়িয়ে, পাণ্ডাদের আক্রমণ এড়িয়ে, পথ খুঁজে, খাবারের দোকান ও বাজার চিনে রেখে যখন বাসায় এসে উঠলাম, সবাই তখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় তীর্থকে ভুলেছে!

বাসাটির নাম 'শ্যামরায়ের কুঞ্জ।' এখানে বাড়ীমাত্রই কুঞ্জ, সুতরাং সম্পূর্ণ ঠিকানাটা হচ্ছে, 'ধীর সমীর, বংশীবট।' একটা নোংরা জীর্ণ অন্ধকার বাড়ী। কবে এক ঝড়ে যে পড়ে' যাবে তা বেশ হিসাব করে' বলা যায়। দেয়ালগুলিতে তীর্থযাত্রীগণের অত্যাচারে আর তাকাবার উপায় নেই—যে-কোনো স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের পক্ষে এই দেয়ালের মাঝখানে বাস করা কঠিন। তার উপর আবার কাঠ কয়লা, ইটের ঢেলা ও পাথরের কুচি দিয়ে আঁক কেটে হাজার হাজার মানুষের নাম লেখা। কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নাম নিঃশব্দে যেন চীৎকার করে' বলছে, আগে আমাকে ছাখো। ভঙ্গুর ও নশ্বর মানুষ কোথাও সামান্য সুবিধা পেলেই যে অমরত্বের প্রলোভন প্রকাশ করে' ফেলে তাতে আর ভুল নেই। আমরা যতই বলি না কেন, মৃত্যু মহান্, মৃত্যু সুন্দর, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃত লাভ,—তবু সে ভয়ানক, সে বীভৎস, সে আমাদের চোখে চিরজীবনের বিভীষিকা! জীবনের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার গোড়ায় যে-প্রবৃত্তি সে হচ্ছে মৃত্যুর বিরুদ্ধে বাঁচবার, মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার, তাকে অস্বীকার করবার। যে বস্তু অল্পায়ু, যে-বস্তু নষ্ট হ'তে দেরী হয় না, যার স্থিতি ক্ষণিক, তার গায়ে আমরা অধিকারের চিহ্ন রাখি কিন্তু নাম লিখিনে,—কিন্তু যার পরমায়ু দীর্ঘ, মহাকালের ভ্রূকুটিকে অবহেলা করে' যে দাঁড়িয়ে থাকে, মানুষের বহু বংশের যে উত্থান-পতনের সাক্ষ্য স্বরূপ—তার গায়েই নাম লেখার আমাদের অশ্রান্ত কাঙালপণা! তাই আমরা নাম লিখি পুরাতন মন্দিরে, মঠে, ধর্ম্মশালার পাথরের গায়ে, গম্বুজের মাথায়। যেখানেই দেখি দীর্ঘায়ুর প্রতিনিধি, সেখানে আমরা জীবনকে আঁকড়ে ধরে' বাঁচতে চাই।

মানুষের সাধারণ দৃষ্টিতে বৃন্দাবনকে নোংরা শহর মনে হ'তে পারে। শহরের শ্রীহীন এবং অস্বাস্থ্যকর চেহারাকে এড়িয়ে ব্রজধামের প্রতি শ্রদ্ধা আসা সত্যিই কঠিন। আজকে বৃন্দাবনের এমন কোন চিহ্নই নেই যাতে মনে হ'তে পারে, একদিন পুরাতন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশারদ, প্রেমিক, মানুষের অবতার, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এখানে দিনযাপন করেছিলেন। পথে বেরিয়ে যে গোপী এবং গোপীনীদের দেখা যায় তাদের দেখে আত্মগোপন করাই উচিত। প্রেমের জন্য পূর্ব্ব-বংশ যে কোনদিন অভিসারে বেরিয়েছিল—তাদের মুখের শ্রী ও ভাষা তার কোন সাক্ষ্যই দেয় না! বেচারী শ্রীকৃষ্ণ!

আমাদের কুঞ্জের মাঝখানে উঠানের উপর একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির, তার একজন সেবাইত্ নিযুক্ত করা আছে। সেবাইত্‌টি বাঙালী, পাশের মহলেই সপরিবারে থাকেন। এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁকে দেখে শুধু পুরুষ মানুষ বলেই বুঝতে পেরেছিলাম, আর কিছু না! মন্দিরের পাশেই একটি তমালের গাছ প্রতিষ্ঠিত। নীচের তলায় মন্দিরে পূজা ভিন্ন আর কোনো সময়ে বিশেষ আনাগোনা নেই—দুর্গন্ধে, স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায়, পোকা-মাকড়ের অজস্র উৎপাতে সেখানে টিকৃতে পারে কা'র সাধ্য! বড় বড় ইঁদুরগুলি মানুষের শাসন থেকে পূর্ণ-স্বরাজ লাভ করেছে।

কুঞ্জের পশ্চিমদিকে একটি দরজা। সেই দরজার ঠিক নীচেই যমুনার তীর। বর্ষার ঢল্ নামলেই সমস্তটা জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়! যমুনা কৃশতনু, কুব্জদেহ, অবসন্ন, তেজোহীন। যাকে বলে বিগত-যৌবনা। সমস্ত উত্তর ভারতে আজ যমুনার যে-রূপ, সে হচ্ছে এমনই শ্রীহীন। সে যেন অতীত মহিমার কঙ্কালিকা! নদীর ওপারেই

শুরু হয়েছে মাঠের পরে মাঠ; তারপর জঙ্গলের পর জঙ্গল, তারপর আবার মাঠ। নদীটিকে ঘিরে কোথাও জনতার ভিড় নেই, কোলাহল নেই, উৎসব-আয়োজন নেই—সমস্তটাই যেমন স্তিমিত, তেমনি অলস। সুদূর প্রাচীনের মোহ-তন্দ্রায় যেন চারিদিক আচ্ছন্ন। বৃন্দাবনের রূপটাই বোধ হয় এমনি। প্রাণের অবিরাম চাঞ্চল্য থেমে গেছে, এখন শুধু উৎসব-শেষের দীপ-নেবা ভাঙা আসর,—একে একে যেন সবাই পার হ'য়ে চ'লে গেছে!

তা হোক, এই মাটীর নীচে একটি মৃত্যুহীন অপরাজেয় আত্মা নিমীলিত নেত্রে যেন গভীর ধ্যানে বসে রয়েছে! এদেশে ঐতিহাসিক স্থানগুলির সঙ্গে পৌরাণিক তীর্থগুলির পার্থক্য অনেকখানি। মদমত্ত রাজশক্তি, পর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার, জন-যৌবন-সিংহাসন-বিলাস-ব্যসন যেখানে আপনাকে শ্মশানে পরিণত ক'রে আজো নিশ্বাস ফেলে নিজ সমাধির চারিপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—সেখানে বুঝতে পারি নটরাজের নৃত্য, জীবনের অনিত্যতা, মিথ্যা দম্ভের ভগ্নস্তূপ কেমন মহাকালের বিদ্রূপের সাক্ষ্য দিচ্ছে! কিন্তু পৌরাণিক তীর্থের অন্য চেহারা। স্মৃতির আলোড়নে মানুষের মস্তিষ্ক এরা উত্তাল ক'রে তোলে না—বরং হৃদয়কে এরা একটি অখণ্ড পরিব্যাপ্তির মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা ক্ষোভ জাগায় না—প্রশান্তি আনে। আমাদের তীর্থ, আমাদের মন্দির, আমাদের দেবতার পূজাপীঠ সেখানেই তৈরী হয়েছে যেখানে পৃথিবীর সীমায় আসন পেতে অসীম বসেছে ধ্যানে! উত্তুঙ্গ তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত-চূড়ায় আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি অমরনাথ, নির্জ্জন আরব সাগরের তীরে আমাদের দ্বারকা-মন্দির, ভারত মহা-সমুদ্রের উপকূলে রামেশ্বরম্, সূর্য্যোদয়ের প্রথম প্রকাশকে অভিনন্দিত

করছে আমাদের কণারকের সূর্য্যমন্দির—এবং হিমালয়ের দুর্গম রহস্যের মধ্যে আমাদের কৈলাস!

বৃন্দাবনে এসে দুটি জিনিষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে' এড়িয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। যমুনায় অগণিত কচ্ছপশ্রেণী ও ডাঙায় সংখ্যাতীত বানর-সেনা। প্রথমটি—জলে নামলে আক্রমণ করতে ছাড়ে না, আর-একটি—অবাধে আহার্য্য-বস্তু লুণ্ঠন করে' নিয়ে যায়। বাঁদরগুলি কথা বলে না বটে কিন্তু তাদের অত্যাচার পৃথিবীর যে কোনো অভিজাত রাজশক্তির মতোই। তাদের 'ডিপ্লোমেসি', তাদের 'পলিটিক্স', তাদের লুণ্ঠনের অপূর্ব্ব কৌশল, তাদের পরস্পরের চরিত্রগত ঐক্য—বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে আশা আর মেটে না! খাবার জিনিষগুলি যদি তাদের হাত থেকে বাঁচাবার তুমি চেষ্টা করো, তাহ'লে তোমার জামা কাপড়, ঘটি বাটি পর্য্যন্ত তারা চুরি করে' নিয়ে গিয়ে তোমাকে জব্দ করতে ছাড়বে না। কিছু খাইয়ে তাদের খুসী করলে তবে সেগুলি ফেরৎ পাবে। ওরা পশুদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট।

বৃন্দাবনে দ্রষ্টব্য বস্তুর যে সত্যিই অভাব তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কেনই বা কিছু থাকবে! এক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ছাড়া যা ছিল তা হচ্ছে কতকগুলি গোরু ও কয়েকটি গোয়ালার ছেলে-মেয়ে। গোরুর দুধ যে সস্তা ছিল তার প্রমাণ এখনো দই এবং রাবড়ি বেশ অল্পদামেই মেলে। এ ছাড়া আক্‌রা আনাজ-তরকারীর ছোট ছোট বেসাতি বসেছে। তার পাশেই একটি বৃন্দাবনী

কাপড়ের দোকান। কাপড়ের দোকানের পরে এক ডাক্তারখানা। সে দোকানের ঔষধে রোগ ত সারেই না, উল্টে ডাক্তার ডাকলেই রোগী মারা যায়। টিম্ টিম করে' তবু দোকানটি চলে। চলে তাদেরই ভরসায় যারা আজো করে দুধ বিক্রি।

কিছুদূর গিয়ে গোবিন্দজীর মন্দির। লাল পাথরের সুন্দর কারু-কার্য্যযুক্ত বিচিত্র বৃহৎ মন্দির। এটিকে উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দিরই বলা যেতে পারে। জগদ্বিখ্যাত যে কোনো শিল্পী এই কারুকার্য্যের কাছে শিক্ষানবীশি করতে পারেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব অনুগ্রহ করে' এই মন্দিরটির মাথা মুড়িয়ে দিয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করেছিলেন! মসজিদের চেয়ে মন্দিরের চূড়া বড় হওয়াটা বোধ করি তাঁর রাজরুচি-বিগর্হিত ছিল।

শেঠীদের বাগান বৃন্দাবনের একান্তে। দুর্গপ্রাকারের ন্যায় বাগানটি চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে ছোট ছোট শিশুমন্দিরের দল। সোনার তালগাছ দেখবার উচ্চ আশা নিয়ে ভিতরে ঢুকেছিলাম, কিন্তু হায় রে—এত বড় বুজরুকি মানুষ নিঃশব্দে সহই বা করে কেন? সোনা (তারো প্রমাণ পাইনি) আছে বটে কিন্তু তালগাছ কই? একটি গাঁদালের গাছ পর্য্যন্তও সেদিকে নেই। উঁচু একটা গম্বুজ দুদিকে দুটো শাখা ছড়িয়ে দণ্ডায়মান। গম্বুজটা সোনা (!) দিয়ে মোড়া। দ্বাপর যুগের মানুষ ছাড়া সেটাকে কেউ তালগাছ বলে' সনাক্ত করবে না। আমাদের সমস্ত হিন্দুতীর্থের মধ্যে এমনি কতকগুলি অকারণ দর্শক-ভুলানো চাতুরী অবাধে চলে' আসছে। যে-ধর্ম্ম এবং যে-শাস্ত্র মানুষের সহজ বুদ্ধি ও সরল দৃষ্টিকে আজগুবি কিছু দিয়ে ভুলোবার চেষ্টা করে—কালে সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে

নাস্তিকের দল। আমরা ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের ন্যায্য ও বৈজ্ঞানিক দিকটা চাপা দিয়ে কতকগুলি ভেল্কির সৃষ্টি করেছি। ধর্ম্মের নামে অসঙ্গত বিশ্বাসকে আকর্ষণ করবার প্রবৃত্তি যতই চলে' যাবে, ধর্ম্ম ততই হবে নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, সংস্কারমুক্ত।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সুন্দর ব্যবস্থাগুলি পরিদর্শন করে' সেদিনকার মতো বাসায় ফিরলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা।

বাসার দরজার কাছে এসে মুহূর্ত্তের জন্য একবার থমকে দাঁড়ালাম। পুরুষ মানুষ দেখেই দরজার কাছে একটি অপরিচিতা মহিলা মাথায় তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালেন। পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকছিলাম, কিন্তু দেখলাম তিনি তৎক্ষণাৎ মাথার কাপড় সরিয়ে আমাকে ডাকলেন—শুনুন!

বয়সের অল্পতা দেখে আমাকে লজ্জা করবার প্রয়োজন তাঁর মনে হোলো না বোধ হয়। মুখের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে তিনি বললেন, আমার একটু উপকার করবেন? আজ আমাদের রান্না হয় নি, কিছু তরকারি এনে দেবেন? এই রাস্তায় বেরিয়েই খানিকটা দূরে গিয়ে দোকান পাবেন।

আমি রাজি হ'তেই তিনি হাত বাড়িয়ে পয়সা দিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার হোক, তবু দেখলাম তাঁর সুন্দর হাতখানাতে কতকগুলো কালশিরার মতো অস্পষ্ট দাগ। মুখে কোনো কথাই না বলে' আমি পয়সা নিয়ে চ'লে গেলাম। একটা কাজ পেয়ে আমার ক্লান্তি কেটে গেল।

অপরিচিতা কোনো নারীর সামান্য প্রার্থিত কোনো উপকার করতে পাওয়ার মতো দুর্লভ সৌভাগ্য পুরুষের খুব অল্পই আছে। বয়স অল্প বলে' মেয়েটি যে আমাকে দূরে ঠেলে দেয়নি তার জন্যে আমি তাকে

ধন্যবাদ দিলাম। পথে যেতে যেতে মনে হোলো, কে বলে বৃন্দাবনের রূপ নেই? কোন্ মিথ্যাবাদী বৃন্দাবনকে কদর্য্য নোংরা শহর বলে' প্রচার করতে চায়? তার মাথায় বজ্রাঘাত হোক!

বাজার করে' ফিরে এসে দেখি, তিনি ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি একবার সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন—সে চাহনির অর্থ, অন্যের কাছে সাহায্য নেওয়াটা হয়ত তাঁর পক্ষে একটু বিপজ্জনক। কিন্তু তিনি সবুর সইলেন না, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে আমার কোঁচড় থেকে আনাজ-তরকারিগুলি নিজেই তিনি খালাস করে' নিলেন।

'এ কি? এত কেন? এত পয়সা ত আমি তোমাকে দিইনি ভাই! বাঁধাকপি আন্‌লে, এ যে এখানে খুব মাগ্যি! ছেলেমানুষ জানতে না, তীর্থস্থানে যে প্রতিগ্রহ করতে নেই।'

বললাম, 'তা'হলে ফিরিয়ে নিয়ে ওসব আমি কি করব?'

মহিলাটি হাসলেন। তারপর বললেন, 'কল্‌কাতা থেকে এসেছ বুঝি?'

'আজ্ঞে না, কাশী থেকে।—আচ্ছা, আপনাকে ত সকাল থেকে এখানে দেখিনি!'

'কোত্থেকে দেখবে? আমি থাকি ও-মহলে। ঘর থেকে ত আর বেরুতে পারিনে! তা ছাড়া বারেন্দার সব দিকেই পরদা টাঙানো!'

'কতদিন আছেন এখানে? দেশে যান্ না?'

'একলা ত নই, উনি এখানকার সেবাইত। ওঁকে ছেড়ে যাবো কোথায় ভাই? ভারি উপকার করলে তুমি! আজ সারাদিন—'

ব'লেই তিনি গলির দিকে একবার কান পেতে তাকিয়ে বিদ্যুতের

মতো ছুটে পালালেন। কা'র যেন পায়ের শব্দ হচ্ছিল! তাঁর পলায়ন স্পষ্ট আতঙ্কের ইঙ্গিত জানিয়ে গেল!

একটি আধাবয়সী লোক এসে দাঁড়ালেন। কাঁচায় পাকায় চুল, কদর্য্য চেহারা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, গায়ে একখানা লাল রঙের লাহোরি ধোসা, পায়ে খড়ম। তিনি হরিনাম করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি দাদা, এখানে দাঁড়িয়ে যে?'

বললাম, 'এই আপনাকেই খুঁজতে বেরুবো কি না তাই—'

'কেন ভাই?'

'শ্যামরায়ের আরতির সময় হোলো কি না, কর্ত্তা মশাই আপনাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন।'

'ওঃ—হেঁ হেঁ, এই এসেছি এতক্ষণে! কেমন, থাকার বেশ সুবিধে হচ্ছে? কোনো কষ্ট নেই?'

বললাম, 'একটু আধটু অসুবিধে হচ্ছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছে। বেশ আনন্দেই আজ থেকে থাকা যাবে।'

'তাই নাকি, বেশ—বাসাটা তাহলে মনের মতই হয়েছে!'—তিনি হেসে ভিতরে চলে' গেলেন।

তীর্থযাত্রীর পক্ষে রাত্রির বাসা অতি আরামদায়ক। আহারাদি সাঙ্গ করে' সবাই এমন ভাবে শয্যা গ্রহণ করলেন যে, হাত পা কেটে নিলেও তাঁদের সাড়া পাওয়া যাবে না। চারিদিকে অন্ধকার থম্ থম্ করছে। নিদ্রিতের নাসিকাধ্বনি আমার নিদ্রাহরণ করছিল।

ভাবছিলাম যমুনার ওপারে অরণ্যের কথা। এপারে নিধুবন, ওপারে বেলবন, মাঠবন, কুঞ্জবন,—এমনি চুরোশি বন। বেলবনে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা আছে। তিন হাজার বছর আগেকার লক্ষ্মীদেবীর

মন্দির! তারপর ছায়া শীতল নিভৃত অরণ্যের পথে যতদূর যাওয়া যায় কেবল ময়ূরের ঝাঁক, হরিণের পাল, চন্দনার ঝাড়,—নানা পশু পক্ষীর অব্যাহত জীবনযাত্রা! মনে মনে চলেছিলাম মাঠের পর মাঠ পার হয়ে। সে-যমুনা কই, যার তীরে কদম্ব-তমালের সারি, শ্রীরাধা আসেন ঘট ভরতে—আনন্দের রসে শূন্যকে পরিপূর্ণ করে' নিতে? কোথা সে বনমালীর বংশীধ্বনি—অনন্তকালের ভাষায় যে ডাক দেয় সৌন্দর্য্যরূপিনীকে?—আবার চলেছি বনের পর বন পার হয়ে! চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ এল—কিন্তু ললিতা কই? চিরবিরহিনী বান্ধবীর বেদনায় যিনি অশ্রুত্যাগ করছেন দিন-দিনান্তে? কোথা সেই সঙ্গীত-ঝঙ্কার, যা চিররাত্রি পার হয়ে অনন্তের কানে কানে বলছে—'নিশি ভোর হ'ল ওই, শ্যাম না এল!' সমস্ত জীবনের তপস্যা আমাদের শেষ হয়ে এল; নৈবেদ্য, উপকরণ, প্রদীপজ্বালা আমাদের ব্যর্থ হোলো, আমাদের অশ্রু উৎসব হোলো মিথ্যা—আমরা তাঁকেই খুঁজছি—সেই সৌন্দর্য্য-দেবতাকে,—যিনি সামান্য স্পর্শে আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করে' তুলবেন, বৃহৎ করবেন! ভূলুণ্ঠিতা হৃদয়-রাধা নিরন্তন তাই জানাচ্ছেন—নিশি ভোর হ'ল ওই!

কিসের যেন শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল! শীর্ণ তীব্র নারীকণ্ঠ অকস্মাৎ চীৎকার ক'রেই আবার থাম্‌ল। বিস্ময়ে চকিত হয়ে উঠে বসলাম! চারিদিকে রজনীর গভীরতম অন্ধকার! কঠিন গুরুভারে সে অন্ধকার যেন বুকের উপর চেপে বসে' দম্ বন্ধ করেছে! আবার! একটা আর্ত্তনাদের শব্দ যেন রাত্রির বুকের ভিতরে শরবিদ্ধ কর্‌ল! কে যেন কা'র টুঁটি টিপে স্বর রুদ্ধ করে' দিল!

'আঃ, কেন ছেঁকা দিচ্ছ? কি করেছি তোমার?'

নিঃশব্দে উঠে বাইরে এলাম। বুঝতে পেরেছি! ও-মহলে পরদার মধ্যে আলো জ্বল্‌ছে।

'কেন বেরিয়েছিলি ওদের সুমুখে? কে তোকে বাজার আনাতে বলেছিল!'

'আনাবো না? ক'দিন থাকা যায় উপোস করে'? আঃ ছাড়ো—উঃ, বাবারে গেলাম যে! এমন যদি করবে, এনেছিলে কেন সঙ্গে করে' আমাকে? কেন ভুলিয়ে অত্যাচার করেছিলে?'

'চোপ্।'—প্রহারের শব্দ শোনা গেল।

'মারো, খুব মারো, আবার মারো—ম'রে যাই! তোমার কাছে থাকার চেয়ে—'

'চোপ্।'

'গরীবের মেয়ে বলে' ফুস্‌লে এনে,—কত লোভ দেখিয়েছিলে মনে নেই?···ভগবানের রাজ্যে···তুমি নিজে খারাপ লোক, নৈলে সব মেয়েমানুষকে এমন সন্দেহ করো? অ-অ-অ।'

বোধ হয় গলা টিপে ধরেছে! নিরুপায় হয়ে পাথরের মতো নির্ব্বাক নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম!

অত্যাচার চললো অনেকক্ষণ! তা' চলুক, আমি এর কী করতে পারি? জীবনে বহু অপমান, বহু অলজ্জ হৃদয়-হীনতা চোখের সুমুখে দাঁড়িয়ে দেখেছি। এর চেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা আছে, বড় বিশ্বাসঘাতকতা আছে, এর চেয়েও ভীষণ পাশবিকতা সংসারে চল্‌ছে!

কিন্তু জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের এই মহাতীর্থে দাঁড়িয়ে এ-দৃশ্যের জন্য আমার মন প্রস্তুত ছিল না—চোখে তাই জল এসে পড়লো। হয়ত আজকের বৃন্দাবনের এইটিই সত্য রূপ! কোন্ এক অলক্ষ্য দানবীয়

শক্তি আজকের পৃথিবীর ভালোবাসা, বিশ্বাস, ত্যাগ এবং সরলতার টুঁটি টিপে মারছে—তাদের বাঁচাবার শক্তি আমাদের নেই, আমরা নিতান্তই অসহায়! অসহায় এবং শক্তিহীন ব'লেই গর্ব্বোদ্ধত অপমান কুটিল হিংস্রতায় জীবনের সকল সৌন্দর্য্যকে পদদলিত করে, নিরাশ করে। হায় রে বৃন্দাবন! হায় রে প্রেমের তীর্থ!

উত্তর বিহারের কোনো শহরে এক রায়-বাহাদুরের বাড়ী অতিথি হয়েছি। আগে কোন পরিচয় ছিল না, বিদেশে বাঙালীর বাড়ী দেখতে পেয়ে গেলাম আলাপ করতে, কথায় কথায় জমে' গেলাম।

খিড়কি দরজার দিকে বাবুদের আস্তাবল, তার পাশে চাকরদের ঘর এবং ঠিক তার পাশেই অতিথিশালা। দু'খানি ঘর। একটি ঘর ছেলেদের পড়াশুনো করবার জন্য, আর একটি কোনো অতিথি অভ্যাগতের জন্য, প্রায় খালিই পড়ে' থাকে। খালি ঘরখানিতে একখানি টুল ও টেব্‌ল, একটি আন্‌লা ও একটি কালিঝুলি মাখা হারিকেন্‌।

ঘরটি পরমানন্দে দখল করা গেল। যদি পথশ্রান্ত কোনো মানুষ সম্পূর্ণরূপে কোথাও একটি আশ্রয় নিজের অধিকারের মধ্যে পায় তবে তার আনন্দ অপরিসীম। যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘরখানিকে কেমন করে' উপভোগ করে' নেবো, ভিতরে বসে' তাই ভাবতে ভাবতে প্রায় একবেলা কেটে গেল।

ঘরখানার দুটো দরজা, একটি খুললে ভিতর-বাড়ীর খানিকটা অংশ

দেখা যায়,—সম্মুখেই জলের কল, গাঁদা ফুলের একখানি বাগান, এবং একপাশে ইঁদারা। আর একটি দরজা একেবারে রাস্তার উপর। কোন্ দরজাটি খুলে কোন্‌টি বন্ধ করে' রাখবো এই হোলো ভয়ানক সমস্যা। অন্দরের মোহ বড়, না বাহিরের আকর্ষণ বড় এই নিয়ে অনেকক্ষণ মাথা ঘামাতে হোলো। এমন একটি অখণ্ড স্বাধীনতা পেলাম, যাতে ঘট্‌লো মানসিক বিশৃঙ্খলা। এই ঘরখানিকে তুলে নিয়ে যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারতাম তাহলে মাথাটা ঠাণ্ডা থাকতো।

কাছারি যাবার আগে রায়-বাহাদুর এসে একবার তদ্বির করে' গেলেন।

—কোনো অসুবিধে হবে না ত' ভাই ?

—আজ্ঞে না, কোনো অসুবিধে নেই। একেবারে স্বরাজ পেয়ে গেছি।

তিনি হেসে বললেন,—খাওয়া দাওয়ার যদি কোনো কষ্ট হয় তবে—

বললাম—তবে নিশ্চয় ত্রুটি মার্জ্জনা করে যাবো।

তিনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে চলে' গেলেন।

শীতের মাঝামাঝি। অন্দর থেকে এক চাকরের মারফৎ তেল, গামছা এবং সাবান এল। চাকর চলে' যেতেই শুঁকে দেখলাম তেলটুকু সুগন্ধি।

স্নান সেরে তৈরী হ'তেই ছোকরা চাকরটা একবার জিজ্ঞেস করলে, আপনি কি ব্রাহ্মণ আছে ?

—কেন বল তো ?

সে ভিতরের দিকে তাকালো। তখন তাড়াতাড়ি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ

ব্রাহ্মণ! জাতকে অস্বীকার করা আজকাল যেন একটা ফ্যাশন্ হয়ে উঠেছে! বলোগে আমি বামুনের ছেলে!

মিনিট পাঁচেক পরে ভিতর থেকে ডাক এল। ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট সম্মান হিসাবে পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত চুকিয়ে পেলাম। কার্পেটের আসন, নূতন কাঁসার গেলাস, মধ্যাহ্নের উৎকৃষ্ট ভোজ্যবস্তু—সে যে কত রকমের তা শুধু 'ইত্যাদি' ব'লেই শেষ করা যাক্। অন্দর-বাটীর সমস্ত দাক্ষিণ্য, বাৎসল্য, সম্মান, স্নেহ ও আপ্যায়ন যেন এই থালাটির চারিদিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

সুমুখের ঘর থেকে একটি বছর সাতেকের ছোট মেয়ে বেরিয়ে এল। এসেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করে' বসলো, আপনি কি স্বদেশী দলের লোক?

তার মুখের দিকে তাকালাম। একটু হেসে কোনো অদৃশ্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে' বললাম, স্বদেশী দলের লোক হ'লে কি রায়বাহাদুরের বাড়ী আশ্রয় মেলে না?

কথাটা এত তীব্র হবে তা নিজেরই জানা ছিল না। এক মুহূর্ত্তেই বুঝলাম, কা'কে যেন আহত করেছি! তৎক্ষণাৎ আবার হেসে বললাম, না, আমি কোন দলেরই নই, নিতান্তই বিদেশী পথিক!

মেঘ কেটে গিয়ে আবার যেন রোদ উঠলো। ছোট মেয়েটি তেমনি অপ্রতিভ হয়ে থামের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। এই মেয়েটি যদি নমুনা হয়, তবে বাড়ীর মেয়েরা যে সুন্দরী তাতে আর ভুল নেই। সুখের ঘরেই রূপের বাসা।

একটি বয়স্থা মহিলা ভাঁড়ার ঘরের আড়াল থেকে কোমল কণ্ঠে বললেন, আর একবার একটি ছেলে আমাদের এখানে এসেছিলেন,

তাঁর কথাই বলছি। দিন তিনেক থেকে তিনি যখন চ'লে গেলেন, তারপরই এল পুলিশের লোক। সে অনেক কথা, ছেলেটি নাকি স্বদেশী দলের। ভাগ্যি, কমিশনার ওঁর বন্ধু, তাই আমাদের কোনো বিপদ ঘটেনি।

বললাম, তা হ'লে অতিথিশালা আপনাদের খালি পড়ে থাকে বলুন? আজকাল ত সবাই স্বদেশী!

অন্য ঘর থেকে হাসির উচ্ছ্বাস ভেসে এল।

আহারাদির পর বাইরে এলাম। বেলা তখন গড়িয়ে গেছে। ছোট মেয়েটি দুটি পান হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। বললাম, খুকি, তোমার নাম কি?

লজ্জায় সে একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, একবার উঁকি মারলো, তারপর আবার মুখ বাড়িয়ে বল্‌লে, আমার নাম জেনে আপনার কি হবে? চ'লে গেলেই ত ভুলে যাবেন।

ওরে বাবা, একেবারে কেউটের বাচ্চা! বল্‌লাম, ভুলে যাবার জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।

ছোট মেয়ে কিন্তু আশ্চর্য্য তার চেতনা! কালো দুটি চোখ তুলে সে একবার দাঁড়াল। তারপর বল্‌লে, রাগ করেছেন বুঝি? খাওয়া দাওয়ার আপনার যত্ন হয়নি?

সে শুধু বুদ্ধির পরিচয়ই দিল না, তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। হেসে বললাম, ভারি অযত্ন করেছ, এত অযত্ন আর কোথাও আমি পাইনি। বলতে গেলে কিছুই খাওয়া হ'ল না!

সে হাসতে হাসতে চলে যাবার সময় ব'লে গেল, আমার নাম ফুলি।

মিনিট দুই পরে মেয়েটি আবার ঘুরে এল। তার গায়ে ঘাগ্‌রা

আর পরণে হাফ-প্যাণ্ট্। বাইরে অন্যান্য ছেলেমেয়ের সাড়া শব্দ পাচ্ছিলাম, তারা এবার এসে ঘরে ঢুকলো। ফুলি কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেল। এত অল্প বয়সে তার এই অস্বাভাবিক সুন্দর গাম্ভীর্য্যটুকু যেন হাসির উদ্রেক করলো। চুপ করে তাকিয়ে রইলাম।

শিবু, শান্তি, আতু, তোমরা শোনো ত' ?

ফুলি তাদের হাত ধ'রে বাইরে নিয়ে গিয়ে কি যেন চুপি চুপি বলতেই তারা অন্য দিকে যে-যার চ'লে গেল। ছোট ছেলেমেয়েদের দলের ফুলি যেন সভানেত্রী।

তারপরে সে আবার ঘরে এসে ঢুকলো। বল্লে, আপনি ঘুমোবেন এই কথা ওদের বললাম। ঘুমোবেন ত ?

যদি না ঘুমোই ?

তবে উঠে বসুন। আমায় কিছু খেলা দেখান্। এই ব'লে সে চুপ করে' দাঁড়াল।

কোনো খেলাই মাথার ভিতর থেকে আবিষ্কার করতে পারলাম না। কিন্তু তার দৃষ্টির কাছে লজ্জিত হবার ইচ্ছাও হ'ল না। পুরুষের ভিতরের কৃতিত্বকে সে যেন আহ্বান করে' বসলো। কিন্তু কী খেলা দেখিয়ে তাকে খুসী করা যেতে পারে ? উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে ভারি টুলটা তুললাম। ফুলি বল্লে, ওকি! ও আমাদের ফুলচাঁদও পারে।

কেউ যা পারে না ফুলি তাই আমার কাছে আশা করে। শক্তির চেয়ে মানুষের বৈশিষ্ট্য যে বড় এ কথা ফুলি যেন কেমন নিঃশব্দে জানিয়ে দিল। কৃতিত্বের চেয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুলি ভালোবাসে।

কোনো খেলাই আর তাকে দেখানো হোলো না।

ফুলি তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম কি ?

তার সঙ্গে আমার অতীত জীবনের কোন পরিচয়ই ছিল না। নিতান্ত নিস্পর পথচারীকে সে যখন এই প্রশ্ন করে' বসলো তখনই বিপদে পড়লাম। আমার নাম ধরে' কোনদিন সে ডাকবে না তবু নাম সে শুনতে চায় কেন ? নাম বলতে পারি কিন্তু চরিত্রের সংজ্ঞা দেবো কেমন করে'। মনে মনে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলাম। মনে হোলো মানুষের নাম জিজ্ঞাসা করার মতো মারাত্মক প্রশ্ন সংসারে অল্পই আছে। মানুষের অনন্ত কল্পনার পারে যে অনাদি আকাশ, তারই কোণে কোণে একাকী অন্ধের মতো একবার নিজেকে আবিষ্কার করবার জন্য বিচরণ করে' এলাম, কিন্তু নাম একটি পাবো কোথায় ! কী আমার নাম ? সমস্ত জীবনে এই নামের মূল্য কতটুকু ? অথচ এই তুচ্ছ নামটুকু সংসারে কত বড় আসনই না অধিকার করে' বসেছে। একটি মাত্র ক্ষুদ্র নগণ্য নাম না থাকলে আমরা কী দরিদ্র, কী রকম একান্তভাবে আত্মপরিচয়হীন !

কই, বললেন না ত ?

বললাম, আমি হারিয়ে গেছি ফুলি, নিজের নাম খুঁজে পাচ্ছিনে।

চোখ পাকিয়ে ফুলি বল্‌লে, চালাকি হচ্ছে বুঝি ?

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এমনি করে' ফুলিকে নিয়েই কেটে গেল। তারপর রাত।

ভোজন-পর্ব্বের পর অনেক রাতে একা আবার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলাম। ছেলেরা একটু আগে পর্য্যন্ত পাশের ঘরে পড়াশুনা করে' চলে' গেছে। ওদিকে আস্তাবলে মাঝে মাঝে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা

যাচ্ছে। তার পাশে ছাগল ও মুর্গীর গোটা তিনেক খোঁয়াড। গোটা চারেক হাঁসও ছিল।

বিছানাটি নরম এবং গরম। মাথার কাছে জান্‌লার ঠিক বাইরে একটা বড় গাছের মাথায় প্রথম বসন্তের হাওয়া হু হু করে' ব'য়ে চলেছে। অন্ধকার নিশুতি রাত। পথে যতদূর দেখা যায় কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। জানালা খুলে বিছানায় শুয়ে ভাবলাম, এই আরামের শয্যা থেকে কাল সকাল-সকাল কিছুতেই ঘুম ভাঙবে না। আজকের এই রাত্রিটির সুখনিদ্রা সমস্ত জীবনে বোধ হয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আনন্দে গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

আলোটি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে মনে হোলো, প্রতিদিনের শ্রান্ত দেহের পক্ষে আরামের এই শয্যার প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু শয্যার কোমল উষ্ণতা যে একটা অস্বস্তি আনে না তাই বা কে বললে? যারা গৃহহীন, পথে পথে যাদের দিন কাটে, ফুট্‌পাথের উপর কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়ে সমস্ত রাত যারা অকাতরে নিদ্রা যায়—এই ঈষদুষ্ণ আরামের শয্যায় শুয়ে যদি তাদের ঘুম না আসে তবে সে কার দোষ? যেখানে কষ্টের আঁচটুকু নেই, যন্ত্রণার লেশ নেই, দুঃখের স্পর্শ নেই—তেমন অনাহত সুখের মধ্যে তৃপ্তি কোথায়? ব্যথার সঙ্গে যে আনন্দের শুভদৃষ্টি হোলো না, সে তৃপ্তি যে অনড, অস্বস্তিকর!

চোখ বুজলাম কিন্তু ঘুম এল না। পিঠে যেন কাঁকর ফুট্‌ছে। মনে হ'তে লাগলো অপ্রতিহত আরামের মতো বন্ধন সংসারে আর কিছু নেই। এরা যেন আমাকে শাস্তি দিয়েছে। মনে পড়ছে বৃন্দাবন, মনে পড়ছে সেই হতভাগিনীর কথা। নির্জ্জন রাত্রিটা অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক মনে হোলো। এই ঘর, এই বিছানা, এই যত্ন, হৃদয়ের

এই দাক্ষিণ্য, এর বন্ধন ছেড়ে, ছুটে পথের মধ্যে একাকী পালিয়ে যাবার জন্য ভিতরটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। উঠে এসে দরজা খুললাম, কিন্তু এত রাতে যাবো কোথায়? বিদেশ বিভূঁই, অপরিচিত লোকের বাড়ী, সকল দরজা বন্ধ। এত রাতে যদি সবাইকে ডেকে বলি তোমাদের এসব আমার কিছুই ভাল লাগছে না, আমায় চলে যেতে দাও, পালাতে দাও, তা হ'লে তারাই বা বলবে কি? কৈফিয়ৎ চাইলে উত্তরই বা কি দেবো? কেমন করে' তাদের বোঝাবো, মানুষকে ভুতে পায়, একমুহূর্ত্তে সমস্ত সংসার মানুষের কাছে তিক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে! সুখ ও আনন্দের মাঝখানে বসে' আমার অন্তরাত্মা ভয়ানক যাতনায় নিশ্বাস রোধ করে' মুক্তি চাইছে—সেই গভীর রাতে আমার মনের এই আজগুবি ব্যথা কে বিশ্বাস করবে?

দরজা জানালা সমস্ত খুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে' দিলাম। কোমল সুখশয্যা আমার কাছে যেন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

যতদূর পর্য্যন্ত অনুভব করা যায় মানুষের সমাগম এদিকে কোথাও নেই। অন্দর বাটীর চারিদিক বন্ধ। তারই ওধারে চাকরদের ঘরগুলি এদিক থেকে নজরে পড়ে না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে আস্তাবলের দিকে গেলাম। অর্দ্ধরাত্রে মানুষের মনে দুষ্প্রবৃত্তি কেন জাগে তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। ঘোড়ার গলার দড়িটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিল। সেটা খুলে তাকে আস্তাবল থেকে বার করে' নিয়ে এলাম। তারপর গেলাম খোঁয়াড়ের দিকে। ছাগল দুটোর দড়ি খুলে দিতেই তারা মুখের আওয়াজ করে' দুদিকে ছুটে পালালো। তারপর খুলে দিলাম হাঁস ও মুরগীর খাঁচা। অন্ধকারে তারা ছাড়া পেয়ে কোন্‌টা

কোন্‌দিকে গেল আর খুঁজেই পেলাম না। দু'মিনিটের মধ্যে বা'র-বাড়ীর এই অন্ধকারে পশুপক্ষীর একটা কোলাহল শুরু হয়ে গেল।

তারপর কতকগুলো ঢিল্ সংগ্রহ করে' এনে দরজার কাছে বসলাম। একটি একটি করে' ঢিল সজোরে ছুড়তে লাগলাম ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করে'। অন্ধকারে সে বেচারা আহত হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করে' বেড়াতে লাগল। তার কাতর ও করুণ অবস্থা দেখে আনন্দ পেলাম।

সোরগোল হ'তেই একটু পরে দারোয়ান ও চাকর-বাকর জেগে উঠ্‌ল। তাদের বিশ্বাস, বাড়ীতে চোর এসেছে। তাদের চীৎকারে সবাই অন্দরের জানালা ও দরজা একটি একটি করে' খুলতে লাগল। রায়বাহাদুর দোতালার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন। ছেলের দল হৈ চৈ করে' উঠলো।

সে কী কেলেঙ্কারী!

পাড়া চমকিত হয়ে উঠলো।

চুপি চুপি দরজাটা বন্ধ করে' আমি বিছানায় উঠে শুলাম। কে একজন ইতিমধ্যে জান্‌লার কাছে আলো এনে আমার নাক ডাকার শব্দ শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে' গেল।

——

কিছুই জানতাম না ; রাত জেগে সকাল বেলায় তন্দ্রা আসছিল, হঠাৎ চারিদিকে চীৎকার শুনে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চাইলাম। রেল গাড়ীতে কথায় কথায় মারামারি বাধে জানা ছিল, গায়ে অমনি কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল—লোকজনের হুড়োহুড়ি পড়ে' গেছে। বেলা আন্দাজ আটটা, মাঠ ঘাট রোদে ভাসছে।

কোলাহল দেখে থতিয়ে গিয়ে বন্ধুবরকে বললাম— কি হ'ল হে শঙ্কর ? বেঞ্চের তলায় লুকোবো নাকি ?

শঙ্কর হচ্ছে ধনী ব্যবসায়ীর যুবক-উত্তরাধিকারী, ভয় পাবার ছেলে সে নয়। বললে—মারামারি নয় হে, আনন্দধ্বনি, গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে একবার চেয়ে দেখো না,—ভানুমতির খেল্ !

দেখলাম নৈনি পার হয়ে এলাহাবাদের কাছাকাছি এসেছি। রেলপথের নীচে প্রান্তরের চারিদিকে অসংখ্য তৃষ্ণার্ত্ত জিহ্বার মতো প্রয়াগ যাবার পথগুলি ছড়িয়ে পড়েছে ; আর সেই পথে পিপীলিকা-শ্রেণীর মত নরনারী মন্থর গতিতে চলেছে। কোনো রাস্তায় আর তিল রাখবার ঠাঁই নেই !

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—এরা সবাই কোন্‌দিকে—তাইত, এত মানুষ ? এত যাত্রীর জায়গা হবে কোথায় ?

শঙ্করের চোখে আনন্দ আব উত্তেজনা ঝরে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্‌লে—১৫ই মাঘ হে, আজ ১৫ই মাঘ—অমাবস্যার মহাকুম্ভ ! এসব ত কিছুই নয়, চলো আগে এলাহাবাদে নামি গে।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই আনন্দ ও হরিধ্বনিতে আবার চারিদিক মুখর হয়ে উঠ্‌ল। শঙ্কর বললে—বাপরে বাপ্‌, কাল রাত-ভোর যে কষ্ট পেয়েছি, ১৪ই মাঘ বম্বে মেলের ভিড় ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে—কি বলো? ইস্‌, মেয়েপুরুষের যে একেবারে গাঁদি, ভিড় ঠেলে যাবো কেমন করে'?

শঙ্কর সকল সময়েই বেশী কথা বলতে পারে। এক পক্ষ কথা না বললেও তার কিছু যায় আসে না। সে বলতে লাগল—কলেরা-ইন্‌জেক্‌সন্‌ নিয়ে এলেই ভালো হতো হে, ব্যাপার তেমন সুবিধে নয়—ওই দেখো, কম্বল চাপা লাশ পড়ে' রয়েছে। এ-হে-হে, তুমি যে ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলে! আচ্ছা, আচ্ছা চলো যাচ্ছি।

ষ্টেশনের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাটা প্রথম দৃষ্টিতে বেশ ভালই লাগল। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর চারিদিক ফিনাইল দিয়ে ধোয়া হচ্ছিল। সমস্ত ষ্টেশনটা তক্‌ তক্‌ করছে। দুজনে বেরিয়ে রাস্তায় পড়া গেল। মেলা এখান থেকে অনেক দূরে, তাহলেও প্রকাণ্ড কিছু একটার আভাস এখানেই বেশ পাওয়া যায়। এলাহাবাদের স্বাভাবিক আবহাওয়া সেদিন চঞ্চল! একটা কোনো আশ্রয় পাবার জন্য দুজনে একটা রাস্তা ধ'রে সোজা চললাম। রাস্তার দুধারি বাড়ীগুলির নীচে ও উপরের দরজা-জানালা-বারান্দায় গৃহস্থরা মুখ বাড়িয়ে যাত্রীর সমাগম দেখছিলেন।

—এই যে, বাঙালী-বাসিন্দেও আছে দেখছি!

বললাম—সবাই ভারি-গেরস্থ তা দেখছ ত? মাছি-মারা কেউ নয়!

কথা কইতে কইতে পথ হাঁটছিলাম। দু'একটা হোটেলে অনুসন্ধান নেওয়া গেল কিন্তু সকল জায়গাতেই স্থানাভাব। অবশেষে এক বাঙালী

হোটেলওয়ালাকে পাওয়া গেল। কাছেই তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তিনি আমাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন।

—এসেছেন আপনারা, একটা উপায় না করে' দিলে লোকে আমাকেই বা কি বলবে! আমি সার্, বুঝলেন না—খুব সিম্পল্ ব্যক্তি, আমার কাছে ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ নেই। আপনারা এসেছেন, হয়ত একদিন কি দুদিনের জন্যে···তা ছাড়া লাভ করবার ইচ্ছে ত আমার নেই আপনাদের কাছে। শ্রীরামপুরে থাকতে একবার—

শঙ্কর বল্লে—আপনার দোকানে খাবো না, এই ঘরটায় শুধু আজকের দিনটা থেকে চলে' যাবো।

খাবেন না?—ব'লে লোকটি একটু বিমর্ষভাবে বললে—তা আর কি করা যাবে? তবে ওই কথাই রইল, শেষকালে ঝামেলা করা আমার ইচ্ছে নয় মশাই, মাথা পিছু ওই এক টাকা করেই দেবেন। আমার আবার ওদিকে—

স্বীকারোক্তি নিয়ে লোকটি তাড়াতাড়ি স্থূল দেহে হেল্‌তে দুল্‌তে চ'লে গেল।

এক ধারে দোতালার উপর শুধু শুকনো একখানি ঘর। ফাঁকা একখানি ঘর ছাড়া আর কিছুরই কোনো ব্যবস্থা নেই। করুণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে শঙ্কর বল্‌লে—উঃ লোকটা কী ব্যবসাদার, এক বাল্‌তি জলও দিল না···এদিকে তেষ্টাও পেয়েছে। তাইত, মুখও ধোয়া হয়নি···চুলোয় যাক্, বেলাও বাড়ছে। চলো, মেলার দিকে বেরিয়ে পড়া যাক্, ঘরে চাবি দিয়ে যাই।

বেলা তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

হিউয়েট্ রোড্ পার হয়ে মোটরবাস্ ধরা গেল। ছ'আনা ভাড়া।

স্ত্রী-পুরুষের ভিড়ে অতি কষ্টেও জায়গা পাওয়া গেল না, ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে গেলাম! রাস্তা অনেক দূর। দুধারে সারবন্দী তীর্থযাত্রীরা চলেছে। সবারই লক্ষ্য এক—কুম্ভমেলা। অর্দ্ধকুম্ভ নয়, পূর্ণকুম্ভ নয়—মহাকুম্ভ! ছত্রিশ বছর পরে আজকের এই একটি দিন। আজ মহাকুম্ভের মহাযোগ। হু হু করে' মোটরগাড়ী ছুটে চল্‌ল। রাস্তাঘাটের পরিমার্জ্জনা বেশ ভালই লাগছিল। মহামারীর ভয়ে পূর্ব্বাহ্নে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রায় দু'ক্রোশ রাস্তা এসে মোটর থাম্‌ল। চারিদিকে চেয়ে হতচকিত হয়ে গেলাম। এই কুম্ভমেলা! এ যে মানুষের মহারণ্য! যেদিকে দৃষ্টি যায় লাখো লাখো মানুষ পোকার মতো কিল্‌-বিল্‌ করছে! ভারতের সকল প্রদেশের সকল জাতির এমন মহামিলন বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের গল্পের কথা হয়ে থাকবে। সর্ব্বজাতির সমন্বয়!

—কোন্‌ দিকে যাই বল তো? একবার ছাড়াছাড়ি হ'লে আর দেখা হবে না ভাই মনে রেখো—শঙ্কর নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে।

ভিড়ের মধ্যে অতি কষ্টে পথ কেটে হাত ধরাধরি করে' অগ্রসর হলাম। নরনারীর অবারিত স্রোতের মধ্যে সবাই ভাসতে ভাসতে চলেছে। কারো প্রতি কারো তাকাবার অবসর ছিল না। পনেরো হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে মাত্র গুটি পাঁচেক নজরে পড়ল, বাদ্‌বাকি কোথায় কোন্‌দিকে কাজ করছে তার ঠিক নেই। শুনেছিলাম, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বাঙালী মেলায় এসেছে, তাদের মধ্যে কচিৎ দুটি চারটি নজরে পড়ছিল। তারা এই ভয়ানক জনতার মধ্যে কোথায় যে তলিয়ে আছে তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া গেল না! একটা রাস্তা ধরে' সোজা দুজনে চললাম। মানুষের পায়ে-পায়ে ধূলো উড়ে দূরে-কাছে আর

কিছু দেখা যাচ্ছিল না। দেখতে দেখতে ধূলোয় ধূলোয় সাদা হয়ে উঠলাম। মাথার চুল, চোখের পাতা, ভ্রূ, জামা-কাপড়, হাত, পা, মুখ —সমস্তই আশ্চর্য্য রকম সাদা। দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে হাসছিলাম। মাঘ মাস, তবুও প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হতে লাগল। রাস্তার ধূলো উঁচুতে উঠে শূন্যপথে দশ মাইল গোলাকার বিরাট একটা চন্দ্রাতপ তৈরী করেছে—মেঘের মতো। সূর্য্যের আলো পাণ্ডুর হয়ে গেছে।

—তুমি একেবারে নিতান্তই যাকে বলে গিয়ে···এলে কি কর্ত্তে? চারিদিক্ দেখতে দেখতে চলো? কত কার-কারবার, দোকান-পত্তর, সিনেমা-সার্কাস, এক্‌জিবিশন-শো—ঐ দেখ আর্ট-গ্যালারী, ওদিকে ক্যাটল্-শো, তারপর—এই দেখো রামকৃষ্ণ-মিশন, ভারত-সেবা-সঙ্ঘ, ওদিকে দেখো······

অনর্গল বক্‌তে বক্‌তে শঙ্কর চল্‌ল। কিছুদূর এসে ধর্ম্ম প্রচারের কতকগুলি কেন্দ্র দেখা গেল। এক জায়গায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বক্তৃতা চলছে। বৈষ্ণবেরা একস্থানে সংকীর্ত্তন শুরু করে' দিয়েছে। মৌলবীরা এক জায়গায় তারস্বরে চীৎকার জুড়েছে। কিন্তু সবচেয়ে করুণ অবস্থা পাদ্রী সাহেবদের—তাঁরা বিস্কুট, লজেঞ্জুস্, খৃষ্টীয় পুস্তিকা, মেম সাহেবের ছবি ইত্যাদি বিতরণ ক'রেও ভিড় জমাতে পাচ্ছেন না! কিন্তু অক্লান্ত চেষ্টায় সবাই তাঁরা অগ্রণী।

—যীশু নাম লিলে টুমার বহুট্ পুণ্য হোবে। টুমি কি জাট্ আছ? টুম্ কৌন জাট্ হ্যায়? হিন্দুষ্টানি?—ও হো হো, বাট্ নেহি শুন্‌টা। চলা যাটা কাহে?

শঙ্কর বল্‌লে—চমৎকার! ওদিকে দেখো হে, মিশনারীর কাণ্ডখানা

দেখো। খৃষ্টানী মত চালাবার জন্য রীতিমত চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। ওদিকে বোষ্টমরা এনেছে মেয়েমানুষ। ধরে' ধরে' বোষ্টম না-করে' ছাড়ে ভাই, চলো সরে পড়ি। আহা, মৌলবীর কোরাণখানির দিকে চেয়ে আমার কান্না পাচ্ছে। বেচারা!

মৌলবীদের পাশেই বসেছে শুদ্ধি আন্দোলনের কর্ম্মীরা! শঙ্কর হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে চল্‌ল। শোনা গেল, ইতিমধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়ে গেছে! পথের ধারে ধারে কয়েক জায়গায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট বসে' গেছে দেখলাম।

—দেখো ভাই দেখো, ধাক্কা মাৎ মারো, জেনানা হ্যায়।

—জেনানা হ্যায় ত ক্যা হ্যায়? হাম ভি জেনানা বন্ গিয়া!

গ্রাহ্যই করে না, ভিড়ের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে আর কোনো তফাতই থাকল না। চেপ্টে চেপ্টে একগুঁয়ে ভিড় সবাইকে সমান করে' দিল!

—আহা-হা, বাঙালী দেখছি, কি হ'ল বাছা? ছেলে হারিয়েছে? ক-বছরের? কেন এনেছিলে বাছা সখ করে'? কাঁদো এখন বসে' বসে'। খুব হয়েছে!

হাঁ হাঁ হাঁ, ক্যা হুয়া? জেনানা কি ইজ্জত......মারো শালা বদ্‌মাস্‌কো, মারো! পাক্‌ড়ো! রে রে রে...

রামের ঘুসি পড়ল যদুর গায়ে। শ্যাম ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করেছে।

—বোলো গৌরীশঙ্কর সীতারাম! হারা হারা বোম্বাহাদেব! জয় শম্ভো!

*　　*　　*　　*

বেলা একটা বাজে। পাড়ের কাছাকাছি এসেছি। উঁচুতে উঠে

চারিদিকে তাকিয়ে দুজনেই হতচকিত হয়ে গেলাম। যতদূর দেখা যায়, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল মানুষের মহাসাগর! বিস্ময়ে আনন্দে বিহ্বলতায় বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে' উঠ্‌ল। অস্পষ্ট সমুদ্র গর্জ্জনের মতো শব্দ সমস্ত দিগ্বলয়কে মুখর করেছে! আকাশ ধূলোয় ধূলোয় অন্ধকার! তার নীচে মানুষের কালো মাথার বিরাট বিচিত্র সমাবেশ। শঙ্করের মুখে আর কথা ছিল না; দশদিকের এই কোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুজনের ভিতরেই হঠাৎ যেন নির্জ্জন নিঃশব্দ হয়ে গেল! বার বার মনে হোলো, ধর্ম্মের মতো এতবড় বস্তু হিন্দুর কাছে আর কিছু নেই। এ জাতির সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, আচার-বিচার, এ জাতির জীবন-মৃত্যু—সমস্তই ধর্ম্মের সূত্রে বাঁধা। এই অনড় অচল মহাজাতি একমাত্র ধর্ম্মের নামেই চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে! সভা-সমিতি, সম্মেলন, রাষ্ট্রসভা, জাতীয় আন্দোলন, কংগ্রেস, স্বাধীনতা-সংগ্রাম—কিছুতেই তার সাড়া মেলে না, ধর্ম্মের আহ্বান তাকে কেমন করে আত্মহারা করে!

ভাবের আবেগ শঙ্করের বাক্‌শক্তিকে বোধ করি রুদ্ধ করেই রেখেছিল। বহুক্ষণ পরে ফোঁস্ করে' একটা নিশ্বাস ফেলে সে বল্‌লে—আচ্ছা এত মানুষ, এরা কি চায় বল তো?

এ কথার কোনো উত্তর ছিল না। এদিকে ওদিকে শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষের অনড় জড়তা শঙ্করের কথার উত্তরে ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষুব্ধ উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌তে লাগল।

ধীরে ধীরে দুজনে আবার পথে নামলাম। কেবলই মনে হতে লাগল, সত্যিই ত কী চায় এরা? কী? এই সংক্ষুব্ধ জনতা শুধুই কি নিরুদ্দিষ্ট অর্থহীন মিথ্যা পুণ্যের জন্য এতদূরে এল! এর মধ্যে কি কোন সত্য বস্তুই নেই? কে উত্তর দেবে?

এবার নদীর চড়ার উপর পথ। মাইলের পর মাইল এই চড়া বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে। ডানদিকে দূরে প্রয়াগের প্রস্তরময় দুর্গ। নীচে নীল যমুনার বাঁক। গঙ্গা এসে উত্তর কোণে মিশেছে। সরস্বতী অধুনা প্রায় লুপ্ত—এদিকে ওদিকে শুধু সুবিস্তীর্ণ বালু-চর। চড়ার পথ বেয়ে আবার চললাম। যেতে যেতে বাঁ দিকে সন্ন্যাসীদের আস্তানা পড়েছে.। সন্ন্যাস যে ভারতের কত বড় নিজস্ব আদর্শ, তা এখানে এলেই চমৎকার আভাস পাওয়া যায় এ কথা মানতেই হবে। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আমাদের দেশে একটি বড স্থান অধিকার করে আছে। বুজরুকি, ভেল্কী, মিথ্যা, ভণ্ডামী বলে' এদের কিছুতেই পেরে ওঠা যাবে না। বংশপরম্পরায় এরা না চাইল প্রতিপত্তি, না প্রতিষ্ঠা, না রাজ্য, না অর্থ, না কিছু! এদের ভোগের স্পৃহাও নেই, ত্যাগের আড়ম্বরও নেই। এরা ভিক্ষাও করে না, ভিক্ষাদানও করে না! সন্ন্যাসই হচ্ছে এদের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়েছে। প্রাচীন ভারতের অরণ্যের নিবিড় নিস্তব্ধ আশ্রমের চারিপাশে ঋষিপুত্রগণের তপস্যাদীপ্ত মুখগুলিকে মনে পড়ল। শূন্য অনন্ত আকাশের নীচে অরণ্যের নির্জ্জনতায় হোমাগ্নির আলো, বনচ্ছায়ার অন্ধকার, সামগান, বেদমন্ত্রপাঠ— যমুনার তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীরা এমনই একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করে রেখেছে। কুম্ভমেলার বড় আকর্ষণ হচ্ছে এরাই। ধনী, মানী, জ্ঞানী, গুণী, ইতর-দরিদ্র, রাজা-রাখাল—সকলেই সমান ধূলি-আসনে করজোড়ে এদের কাছে এক একবার এসে বসছে। অনেক সন্ন্যাসী, হাতী এবং উটের পিঠে চড়ে' একদিক থেকে আরএকদিকে চলে যাচ্ছে। জনকয়েক শিক্ষিত সন্ন্যাসী দেখা গেল, তাঁরা

গাড়ীর মধ্যে বসে' চোখে চশমা লাগিয়ে ইংরেজী কাগজ পড়ছিলেন। অনেকে আবার পাল্কীতেও এসেছেন। সন্ন্যাসীকে আমরা সর্ব্বহারা, অশিক্ষিত, বিভূতিমাখা, তপঃসিদ্ধ নির্ব্বাক যোগীর মতো দেখতে অভ্যস্ত, —তাঁদের গাড়ী চ'ড়ে বক্তৃতা দিয়ে চশমা লাগিয়ে ইংরেজী পড়তে দেখলে আমরা খুসী হইনে। দু-তিনটি যুবতী মেয়ে ও গুটিকয়েক পুরুষকে দেখলাম কয়েকজন সন্ন্যাসীর পা ধ'রে কাঁদতে শুরু করেছেন। সত্যই তাঁদের চোখের জল দেখলে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।

শঙ্কর বল্‌লে—সুন্দরী মেয়ে যে, কাঁদে কেন, খোঁজ করলে হয় না?

দু-একজন তার কথার জবাব দিল—সন্‌সার ছোড়্ কর সন্নিয়াসী কো সাথ্ কো চলা যানে মাঙ্‌তা হৈঁ। উয়া লেড়্‌কি বড়া ভারি আদ্‌মিকা আওরৎ হৈঁ! সীতারাম!—দেখো দেখো ভাই সাব্, রেণ্ডিকো দিল্‌কা মর্‌দি দেখো জনাবালি!

—বেশ্যাও সন্ন্যাস নিচ্ছে, আমরা আর কোন্ লজ্জায় দাঁড়িয়ে থাকি, চলো এগোই।

শঙ্কর আবার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চলল। সন্ন্যাসীদের দেখতে দেখতে বহুদূর অতিক্রম ক'রে আসা গেল। হঠাৎ ভিড়ের স্রোতে একটা জোয়ার দেখা দিল। সে কি প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

—সামালো সামালো, রোখো—আদ্‌মি মর যায়েগি—বেকুব কাঁহেকা—জেনানাকো বাঁচ্ লেও—বড়া জব্বর—ভারি চোট লাগ গিয়া—আরে বাপরে—এ লছমি পর্‌সাদ।—ওমা কোথা দে বেরোবো মা—ওগো বাবাগো।—তুম্ কিস্‌কো আওরৎ?—ও হো হো হো!

ভিড়ের মধ্যে কারো হাত পা জখম হল, কারো দম বন্ধ হল,

কেউ পায়ের তলায় প'ড়ে চেপ্‌টে গেল,—আর মেয়েদের অবস্থার কথা বলতে গেলে ত লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

—বাঙালীর দল মনে হচ্ছে, ধূলোয় ধূলোয় আর চেনবার উপায় নেই! কি হ'ল গা বাছা? চুপ চুপ, অত চেঁচিয়ে কেঁদে কোনো লাভ নেই। চুপ করো। কি হ'ল শুনি? দেশ কোথায়?

—চব্বিশ পরগণা! আমাদের লোক হারিয়েছে বাবা।

—লোক? মেয়ে না পুরুষ?

—দুজনেই, বাবা, আমাদের গাঁয়ের অনঙ্গ আব আমার ছোট মাসি।

—মাসি? বুড়ো মানুষ বুঝি?

—না বাবা না, অনেক ছোট আমার চেয়ে। এই হদ্দ তিরিশ বছরের মেয়ে। এনে দাও বাবা, তোমাদের পায়ে পড়ি—টাকা কড়ি সব তাদের কাছে। অনঙ্গর সঙ্গে সঙ্গে সে আসছিল, তারপর ভিড়ের মধ্যে এসে আর......

—দাঁড়াও বাছা, খুঁজে দেখি।—ব'লে শঙ্কর হাত ধ'রে চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে বললাম,—কই খুঁজলে না ত?

—পাগল আর কি, বুঝতে পারোনি? পালাবে ব'লেই ওরা পরামর্শ করে' এসেছিল। এ সব শুন্‌লে আমি ভারী খুসী হই। আমাদের সমাজে এগুলো খুব দরকাব হয়ে পড়েছে, বুঝলে? চলো, যে দিকে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, বাঙালীর মেয়ে এত বেশী হারায় কেন বলতে পারো?

পথ চল্‌ছিলাম। শঙ্কর বলতে লাগল, বাঙালীর মেয়ে হারায়, বাঙালীর মেয়ে পালায়, বাঙালীর মেয়েরা বেশী তীর্থ করতে আসে,

বাঙালীর মেয়েরা বেশী অসাবধান-- কেন বল তো? আমার মনে হয়, এ সমস্তই এদের স্বেচ্ছাকৃত।

— তার মানে?

—মানে অত্যন্ত জটিল। শুন্‌লে দেশে গিয়ে হয়ত তোমার ভাতে রুচি চ'লে যাবে।

উত্তর নেবার বিশেষ আগ্রহ ছিল কিন্তু ততক্ষণে ঘাটের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম, আর শোনা হোল না।

* * * *

যমুনায় নেমে পা ডুবিয়ে বাঁচলাম। নৌকা কাছেই ছিল। 'সঙ্গমে' যাতায়াতের ভাড়া মাথা পিছু বারো আনা, দরদস্তুর করবার মতো শরীরের অবস্থা তখন আর ছিল না। উঠে বসলাম। অনেকগুলি লোক নিয়ে যমুনার গাঢ় নীল জলের উপর দিয়ে নৌকা ভেসে চল্‌ল। নদীর উপর সহস্র সহস্র নৌকা কুমীরের মতো গিজ গিজ করছে। জলের উপর সে যেন নৌকারই রাজ-রাজত্ব! যোগে স্নান করবার জন্য সবাই ব্যস্ত, বিহ্বল ও উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আকাশে উড়োজাহাজ ভাসছে, জলের ধারে মাচা বেঁধে বায়োস্কোপের ছবি তোলা হচ্ছে,— এ-পারের মতো ও-পারেও অবিরত জনস্রোত। পৃথিবীতে সেদিন মহা-কুম্ভের মেলা ভিন্ন আব কোনো বস্তুরই বোধ করি অস্তিত্ব ছিল না। দুই তীরে নদীর মাথায় ধূলিসমাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশ, মানব সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনধ্বনি, প্রাণীজগত সশঙ্ক ভয়াতুর—মানুষের ধর্ম্মভাবের উত্তেজনা জগতে সেদিন যেন প্রলয় এনেছিল! কোথাও শিঙা বাজছে, কোথাও ডমরুধ্বনি, কোথাও হরিধ্বনি, কোথাও নাচগান, আবার কোথাও মারামারি।

নৌকা চল্‌ছে। দাঁড়ের আঘাতে জলের শব্দ হচ্ছে। রোদের তাতে সবাই গলদ্‌ঘর্ম্ম। কোনো নৌকায় মেয়েরা গান ধরেছে, কোথাও পুরুষেরা হল্লা করছে, কোথাও কলহ-বিবাদ বেধে গেছে।

প্রায় তিন মাইল জলপথ। জলপথ পার হয়ে সঙ্গমের কাছাকাছি এসে যে-দৃশ্যটি প্রথম চোখে পড়ে, সে-দৃশ্য সচরাচর কোনো তীর্থস্থানেই দেখা যায় না। ত্রিবেণীর পরিধি অন্তত দশ মাইল, সেই দশ মাইল জল এবং চড়া সহস্র সহস্র নৌকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। জলে, ডাঙায়, আশেপাশে, সম্মুখে, পিছনে, দূরে, নিকটে নৌকার উপরে জলের মধ্যে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক পোকার মতো কিলবিল করছে। নরনারী নির্ব্বিশেষে—আবালবৃদ্ধবনিতা—সাধু, চোর, সম্ভ্রান্ত, ডাকাত, গুণী, মানী, খুনে, দুশ্চরিত্র, ঠগ, ধনী, গরীব, ইতর, ভদ্র—সবাই একাকার হয়ে গেছে। ত্রিবেণীর এই জনারণ্যের মধ্যে স্নান করতে এসে নরনারীর লজ্জাসম্ভ্রমবোধ ছিল না, বাচ-বিচার ছিল না, আব্রু ছিল না, গোপনতা ছিল না, আত্মসংযম ছিল না। কিন্তু এ ছাড়াও তখন অন্য কথা মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম যাত্রীদের এই স্নান-দান এবং পূজার মধ্যে একটি বিশেষ অর্থ নিহিত রয়েছে। হোক কুসংস্কার, হোক অন্ধ পৌত্তলিকতা কিন্তু মানুষের জীবনে এর প্রয়োজন আছে। কিছুই না মেনে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে আত্ম-প্রসাদ থাকতে পারে কিন্তু চোখের সামনে এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলিকে পরিচ্ছন্ন করবার চেষ্টা, মানুষের ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাকৃত অন্যায়কে স্খালন করবার এই যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার এই যে ঐকান্তিক বাসনা—এর মধ্যে একটি সত্য আছে। পাপের প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা এবং পুণ্যের প্রতি এমন

স্বাভাবিক আকর্ষণ পৃথিবীতে আর কোনো জাতির মধ্যে দেখা যায় না। Law of human mindকে স্বীকার করেছে হিন্দুরাই, মনের purificationকে তাই তারা এত বড় আসন দেয়। হিন্দুধর্ম্মের বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাতায় তাই লেখা আছে—স্নান দানে প্রথম পুণ্য।

* * * *

সেই নৌকাতেই আবার দুজনে ফিরলাম। ফিরবার পথে 'মস্তক-মুণ্ডনের' ক্ষেত্রটি দেখা গেল। বহু সহস্র যাত্রী এখানে মাথা মুড়িয়েছে। মাথার চুলে প্রকাণ্ড একটি প্রান্তর অন্ধকার হয়ে রয়েছে—'প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা মরগে পাপী যথা তথা।' সেখান থেকে পার হয়ে নাগা এবং নাগানীদের সম্প্রদায় দেখা গেল। যাত্রীদের সেখানে ভয়ানক ভীড়। সম্পূর্ণ নগ্নদেহ সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীর যে এত বড় আকর্ষণ থাকতে পারে তা জানা ছিল না। স্ত্রী-পুরুষে লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়েছে। দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই,—অবারিত অকুণ্ঠায় উলঙ্গিনী নারী ইতস্তত বিচরণ করছে। আপাদমস্তক বিভূতি মাখা, মাথায় জটা, চোখে ত্যাগের আবেশ, দেহের প্রতি অকুণ্ঠ বৈরাগ্য, জীবনের প্রতি একান্ত ঔদাসীন্য—জগতে আর কোথাও এমন দেখা যায় না!

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বাসার পথে চললাম। পথে যেখানে সেখানে মাঠে ঘাটে, নদীর ধারে, বালির ডাঙায়- যেখানে স্থান পেয়েছে, পরিশ্রান্ত যাত্রীরা আশ্রয় নিচ্ছে। যাত্রীদের জন্য পথের মাঝামাঝি খুব সাবধানে নতুন একটি রেল লাইন এক মাসের জন্য তৈরী করা হয়েছে; শহর থেকে 'সঙ্গম' পর্য্যন্ত যাত্রীরা যাতায়াত করছে। কিন্তু ট্রেণে বড় একটা কেউ উঠতেও চাইছে না।

অতিরিক্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা শঙ্করকে নির্ব্বাক করে' দিয়েছিল।

—কি গো, কি হ'ল তোমার ?

বাঙালীর মেয়ে, বয়স বছর কুড়ি একুশ, মাথা নেড়া, রঙ একটু কালো। বল্‌লে—হারিয়ে গেছি, আমাদের লোক সব কোন্ তাঁবুতে আছে! পুঁটুলি নিয়ে বেরিয়েছিলাম, বলি বসো তোমরা, ওই দোকান থেকে খাবার কিনে আনি। খাবার নিয়ে আর চিনে ফিরতে পারিনি।

—পুঁটলি নিয়ে বেরোলে কেন ?—শঙ্কর বল্‌লে।

—যদি হারিয়ে যায় তাই জন্যে সঙ্গে সঙ্গে—

—কার সঙ্গে এসেছ ? দেশ কোথায় ?

—নবদ্বীপের কাছে, গাঁয়ের লোকের সঙ্গে এসেছিলাম।

—পুরুষ মানুষ আছে সঙ্গে ?

—না।

শঙ্কর বল্‌লে—চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি—কিছু ভয় নেই।

—আপনারা চিনবেন কি ক'রে ?

—আমরা সে কথা বুঝবো, চলো না তুমি বাছা।

—সে আমার সাহস নাই। কোন্ দিকে তাঁবু আমি ভুলে গেছি।

—বেশ ত, সেবাসঙ্ঘে পৌঁছে দিয়ে আসি, তারপর তুমি খোঁজ পাবে, সে ব্যবস্থাও সেখানে আছে।

ঘাড় দুলিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি বল্‌লে—সেখানে যেতে আমার ভয় করে,—কত রকম লোক,—একলা মানুষ আমি···

অনেক মিনতি করা সত্ত্বেও মেয়েটি সেখান থেকে নড়ল না। শঙ্কর তখন কাছে স'রে এসে বল্‌লে—যাবার বুঝি তোমার ইচ্ছে নেই ? এই খোট্টার দেশে বিশেষ সুবিধে হবে না বাছা, যাও দেশে ফিরে যাও, লক্ষীটি, এ পথ বড় খারাপ।

এ অপমানও মেয়েটিকে আঘাত করল না। শুধু বল্‌ল—কি যে বলেন আপনি,—আমি তেমন নই।

—তুমি যে কেমন তা জানি আমি, নৈলে পুঁটলি নিয়ে বেশ গুছিয়ে বেরোবে কেন বলো। যাও তবে যেদিকে খুসি, আমরা আর কি করতে পারি! এসো হে, ভারি গরম হচ্ছে।

দুজনে চ'লে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালাম, আমাদের দিকে মেয়েটি তখনও এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল!

বাসায় ফিরে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার আহার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরোলাম। তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

একখানা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রাত্রে আমরা ঘুরতে বেরোলাম। বড় বড় রাস্তাগুলিতে আলোর ব্যবস্থা আছে, আশপাশে সমস্তই অন্ধকার। অনেক রাস্তা, অনেক অলিগলি ঘুরে ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ষ্টেশনে ঢুকে শঙ্কর সোজা কেল্‌নারের হোটেলে গিয়ে ঢুকল। দুজনে বেশ কিছু খাওয়া গেল। শঙ্করের উদ্দাত একটি বিচিত্র তৃষ্ণাকেও সে হোটেলে ব'সে মিটিয়ে নিল। দুজনে আবার যখন হোটেল থেকে বেরোলাম, শঙ্করের তখন আর কোনো ক্লান্তি বা অবসাদ নেই, তখন তার একটু নেশাও হয়েছে।

মানুষে মানুষে রাত্রে ষ্টেশনের সমস্ত দিক ছেয়ে গেছে। শোনা গেল, মেলার জন্য 'মেলা রেক' নাম দিয়ে দুইশত খানি স্পেশাল ট্রেণ নিযুক্ত করা হয়েছে। আজকের যোগ সেরে বহু যাত্রী এখান থেকে চ'লে যাবার চেষ্টা কচ্ছিল।

দুইজনে ভিড় ঠেলে ঠেলে আবার বেরিয়ে এসে যেখানে দাঁড়ালাম

সেখানে সুমুখে খাবারের দোকানের আলো এসে পড়েছিল। কি করব তাই দুজনে ভাবছিলাম।

—দেখুন, আপনারা কি এখানকার লোক?

করুণ মিহি গলার আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালাম। দেখি রাস্তার নর্দ্দমার কাছে তিনটি মেয়ে ব'সে রয়েছে। একটি অবগুণ্ঠনবতী। অন্যটি ভৈরবী—আপাদমস্তক গেরুয়ায় ঢাকা, মাথার পুরুষের মতো ঝাঁপা ঝাঁপা ছাঁটা চুল—সুন্দর মুখ, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, দাঁতগুলি পরিচ্ছন্ন, কৃশ একখানি দেহ- বয়স বোধ ক'রি পঁচিশ হবে। অন্য মেয়েটি বিধবা—বয়স বছর তিরিশ।

অবগুণ্ঠনবতীটি বসেই রইল। সন্ন্যাসিনী ও বিধবাটি উঠে দাঁড়িয়ে করুণ-কণ্ঠে বল্‌লে—বাঙালী কাউকে আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কুলির মাথায় জিনিষ দিয়ে আমরা সঙ্গমের দিকে কাল যাচ্ছিলাম, কুলি বেটা চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, বিছানাপত্র টাকা কড়ি কিছুই আর আমাদের নেই, ভারি বিপদে পড়েছি।—বলতে বলতে বিধবা মেয়েটি কেঁদে ফেললে।

কাছে দাঁড়িয়ে শঙ্কর বল্‌লে—কোথাকার লোক আপনারা?

তারা নিজেদের পরিচয় দিল। বিহারের কোনো গ্রামে সন্ন্যাসিনীটির একটি আশ্রম আছে, বিধবাটি সেখানকারই কোনো ষ্টেশন মাষ্টারের আত্মীয়া—এ ছাড়া তাদের আর কোনো পরিচয় নেই।

শঙ্কর বললে—কোনো ভয় নেই আপনাদের, আপনারা কি এখুনি চ'লে যেতে চান্?

ভৈরবী বললে—বেশ ত আপনি,—কি করে যাবো? টাকা নেই, কড়ি নেই, তা ছাড়া কাল থেকে একেবারে নির্জ্জলা উপবাস করে'—

—তবে ষ্টেশনের ধারে এসেছিলেন কেন ?

—কি করব বলুন ! এখানে তবু আলো আছে নৈলে ত্রিবেণীর মেলার ওদিকে রাত্তিরে অন্ধকারে···ছি ছি, মেয়ে হয়ে জন্মানো কি এতই জ্বালা ? মাঠে, ঘাটে, পথে, সে কুৎসিত কেলেঙ্কারী···আপনারা বুঝি জানেন না ?

—কি করে' জান্‌বো, আমরাও যে নতুন লোক।

কিন্তু সন্ন্যাসিনী ও বিধবাটির সরলতায় আমরা খুসী হয়ে গিয়েছিলাম।

—আমাদের সঙ্গে কেউ নেই। ভয় হ'ল—রোজ রাতের বেলা··· আপনাদের বলব কি, সেখানে পাপের স্রোত বয়ে যায়। মেয়েরাও কম নয় ! তারপর ঘোমটা-ঢাকা মেয়েটির দিকে দেখিয়ে তিনি আবার বললেন—এ মেয়েটি আমাদের কেউ নয়. হিন্দুস্থানী মেয়ে,– যার সঙ্গে এসেছিল সে এ'কে ছেড়ে দিয়ে কোথায় পালিয়েছে। পুরুষ মানুষের এইগুলো ভারি অন্যায়। এত রূপ নিয়ে রাতের বেলায় এ কোথায় যায় বলুন ত, একে তাই আমার কাছেই রেখেছি। তিন জনের ভাগ্য এক সঙ্গে বাঁধা পড়েছে।

মেয়েছেলের উপকার করতে পারলে শঙ্কর আর কিছু চায় না। নেশায় তার চোখ দুটো জড়ানো, তবু নানা আশ্বাস দিয়ে অনেক কথা অনর্গলভাবে সে ব'লে যেতে লাগ্‌ল। অবিশ্রান্ত কথা বলতে গিয়ে তার কথাগুলো একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল—অবশ্য এলোমেলো হয়ে যাওয়াই তখন তার পক্ষে স্বাভাবিক। গোপনে গা টিপে তাকে থামিয়ে দিলাম।

ওঁদের বললাম—কোনো ভয় নেই আপনাদের, আমাদের বাসায়

চলুন, রাতটা থাকবেন, খাবার দাবার নিয়ে যাচ্ছি। কাল আপনাদের সব ব্যবস্থা করে' দেবো আমরা। পয়সা কড়ির সাহায্য নিতে দ্বিধা করবেন না, আমাদের আত্মীয় মনে করবেন। ঘরটা আমাদের একটু ছোট, তা হোক, কোনোরকমে কুলিয়ে যাবে। আর দেরী করবেন না, আসুন।

শঙ্কর সেই যে থেমে গেল আর কথা বললে না, নিদ্রাজড়িত চোখ দুটো তার লাল হয়ে উঠেছিল। তাকেই এখন সাম্‌লে ঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার।

সন্ন্যাসিনী, বিধবাটি ও ঘোমটা-ঢাকা সুন্দরীটি উঠে দাঁড়ালো। একটা গাড়ী ডাকলাম। সন্ন্যাসিনীটি পরম আত্মীয়তায় আমাদের হাত ধরে' হেসে ধন্যবাদ জানালেন। পরে বললেন—এই বিদেশে আর এই রাতের দুর্যোগে আপনাদের বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এ উপকার যেন চিরকাল মনে রাখতে পারি।

সবাই মিলে বড় একখানা গাড়ীতে উঠে বসলাম। অলিগলি পার হয়ে অন্ধকারে বাসার কাছে এসে সবাই যখন নামলাম, রাত তখন সাঁ সাঁ করছে। জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও নেই। বললাম —দাঁড়ান্ দেশলাই জ্বালি, ভারি অন্ধকার।

শঙ্করের তখন পা টল্‌ছে। দেয়ালে ভর দিয়ে সে দাঁড়ালো। তার অবস্থা দেখে ভীত হলাম। চুপি চুপি কাছে গিয়ে বললাম, নিজের উদারতায় অপরিচিত মেয়েদের আশ্রয় দিয়েছ। দোহাই, ওদের যেন অপমান করো না ভাই!

'অনেকবার ত হাল ভেঙেছে
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে,
হায় রে মরণ লুভী,
ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যার আছে নৌকাডুবি ?'

আবার বেরিয়েছি ভ্রমণে। দিল্লীর পথ দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে রাজপুতনার হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে চলেছি। পথে কোনো বৈচিত্র্য নেই, মনটা এলোমেলো। চোখ দুটো কেবল খোলা, মনের কাজ বন্ধ। লোকালয় কমে এসেছে, পথে জলা-বিল-নদী বিশেষ নেই, প্রকৃতি নিরাভরণা ভৈরবী,—সকল অলঙ্কার আভরণ তিনি খুলে রেখে এসেছেন জাহ্নবী-যমুনার দেশে। এদিকে তাঁর তপস্বিনীর রূপ, কৃচ্ছ সাধনে বিশীর্ণা।

মানুষের চেহারা বদ্‌লালো, বদ্‌লে গেল মাটীর রং,—পুরুষের মাথায় এখন রঙীন পাগ্‌ড়ি, মেয়েদের পরণে রংদার ঘাঘরা, মাথায় ওড়না। মরুভূমির দেশের নাচওয়ালীর মতো চেহারা তাদের। চোখে কাজল, কানে অলঙ্কার, হাতে মোটা মোটা বালা, পায়ে জরির চটিজুতো। নদীর দেশের মেয়ে তারা নয়. মাথায় জলের ঘট ভরে' নিয়ে দল বেঁধে তারা পথ দিয়ে গান গেয়ে যায়,—পুরুষরা পণ্যসম্ভার নিয়ে যায় নগর থেকে নগরে। যোধপুর, আজমীঢ়, জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি তাদের কেন্দ্র। তাদের মাঠগুলি দুর্ব্বাশ্যামল কোমল নয়, মাঠের প্রান্তে তাল-সুপারি-নারিকেল-শাল-সেগুনের বনরেখা নেই,—

তাদের মাঠের রুদ্র-রূপ,—রৌদ্রের আভায় অনন্ত বালুরাশি কোটি কোটি হীরকখণ্ডের মতো ঝলমল করে। বিবর্ণ আকাশ মেঘের তৃষ্ণায় কাঁদে, উলঙ্গ প্রান্তর রুদ্র দেবতার নিরন্তর অভিশাপে দিন-দিনান্ত দগ্ধ হ'তে থাকে। দোয়েল, শ্যামা, ঘুঘু আর বুলবুলির দল সেখানকার মাঠে ধান খেয়ে যায় না, সেখানে ঘুরে বেড়ায় পথভোলা হরিণ-হরিণীর পাল, ময়ূর-ময়ূরীর ঝাঁক। গ্রামগুলি দরিদ্র, জলচিহ্নহীন, জীবনের প্রবাহটুকু অতিকষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

কোনো বৈচিত্র্য নেই, ঘটনার নেই প্রতিঘাত,—আবর্ত্ত না এলে নদীর প্রবাহে কলধ্বনি জাগে না। আবর্ত্তহীন প্রবাহ ফল্গুর মতো নিঃশব্দ। চলতে চলতে নামা গেল আজমীঢ়ে। দেশের ভাষা জানিনে, তা উর্দ্দুও নয়, হিন্দিও নয়,—তারা অদ্ভুত। মনটা ক্লান্ত, কারণ আর কোনো কাজ নেই। প্রথমেই চোখে পড়লো, সাদা রৌদ্রে রাঙা পাথরের শহর। লাল প্রাসাদ, লাল গম্বুজ, লাল বাজার, লাল পোষাকের আড়ম্বর! চোখ জ্বালা করে, মন খুঁৎখুঁৎ করে। পথে পথে বালি আর ধূলো। খাদ্যের মধ্যে স্নেহের রস নেই—ডাল, ভুট্টা, গম, শক্ত গুড়, ছোলা এরাই প্রধান। মাটী কোথাও নেই, পাথরের পর পাথর। সেই পাথরের প্রাসাদের শিরে দেখা যায় টিয়া-চন্দনার ঝাঁক।

নিকটে আরাবল্লীর পাহাড়শ্রেণী। পাহাড়ে যেতে গাড়ী পাওয়া যায়। শীর্ণকায় অশ্ব গাড়ী টানে। নিয়ে যায় নয় মাইল দূরে পুষ্কর তীর্থে। রাঙা পাহাড়ের পথে উঠে গাড়ী গিয়ে আবার নামে পুষ্কর-হ্রদের তীরে। ওপারে দূরে পাহাড়ের মাথায় সাবিত্রী দেবীর শ্বেত-পাথরের মন্দির, এপারে গায়ত্রীর মন্দির। ওপারে পদব্রজে যেতে হয়, পথ বালুময়, কণ্টকাকীর্ণ। চর্ম্মপাদুকার চলন নেই, নগ্নপদে

যাওয়াই বিধি। আন্দাজ দুই মাইল পথ। সাবিত্রীর মন্দিরের উপর দাঁড়ালে দিক্-দিগন্ত-মরুময় রাজপুতনা দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মরুভূমি ছিল সমুদ্র এমন কথা মনে হ'তে থাকে। সাবিত্রী এবং গায়ত্রী ছিলেন ব্রহ্মার দুই স্ত্রী।

জয়পুর আজমীঢ়ের সমগোত্র। এখানে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন অপেক্ষাকৃত প্রচুর। পথে নেমে পাহাড়ের উপর মহারাজার সুন্দর প্রাসাদ প্রথমেই চোখে পড়ে। এটা খাসমহল। এক শহর অন্য শহরের অনুকৃতি —সুতরাং নতুন কিছু নেই। রাজপুতনার মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা এখানে বেশী। বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ পরিবার এখানে এসে ভাগ্য ফিরিয়েছেন। এখানকার রাধা-গোবিন্দজীর মন্দির বিখ্যাত। বৃন্দাবন ও মথুরা থেকে শ্রীকৃষ্ণ এই পথ দিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারকাপুরীতে। সহস্র মাইল পথ তাঁর পদচিহ্ন ধারণ করে' রয়েছে।

জয়পুর থেকে আবু রোড। আবু রোডে নেমে প্রথম পাওয়া গেল নদী। নদীর নাম বানাস। শীর্ণ বালুময় পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী। নদীর পরপারে আবু পাহাড়ের জঙ্গল। জলাশয় না থাকলে জঙ্গলের খোঁজ পাওয়া যায় না। দেশটি শস্যে ও সব্জীতে ঐশ্বর্য্যময়। তীরে ছোট ছোট লোকালয়,—নদীটি ঘরোয়া। মেয়েরা ঘট ভরছে, পুরুষেরা চাষ নিয়ে ব্যস্ত, ছোট ছেলেমেয়েরা নদীর চড়ায় সারাদিন ধরে' তৈরী করছে খেলাঘর। নদীটির ধারার সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রা বাঁধা। ওপারে জঙ্গলের ভিতরে একটি হিন্দুতীর্থ, তার নাম হৃষীকেশ। অরণ্যের

গভীর গহ্বরে একটি ঝরণার ধারে মহাদেবের মন্দির। লোকালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সভ্যজগতের সঙ্গে নেই সংস্পর্শ,—প্রাচীন মুনির মতো সে-মন্দির আপন ধ্যানে আপনি বিভোর। পথিকজন গিয়ে দাঁড়ালে বৃদ্ধ পূজারী তৃষ্ণার জল দেন্। ছায়া ঝিলিমিলি প্রাচীন বৃক্ষের তলায় পরিশ্রান্ত পরিব্রাজক নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করে।

প্রাণের মধ্যে কোথায় একটা তাড়া আছে, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াবার তার একটা দুরন্ত দাবি। নতুন দেশে এসে নামি, নতুন চোখে চেয়ে দেখি—দেখতে দেখতে শ্রান্তি আসে। মন বলে, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।'

পথের হিসাব নেই, রাশ-আল্‌গা-করা মন। দেখতে দেখতে ফুরোতে হবে, ফুরোতে ফুরোতে নব নব সঞ্চয়,—আমাদের দেশের বাউল বলে, দেখতে দেখতে দেখা হবে পরম দর্শন! দর্শন মানে দেখা নয়, দিব্যদৃষ্টি পাওয়া, যার পর আর কিছু নেই,—সব দেখা এসে মিলেছে দর্শনের মহাসঙ্গমে। তারই নাম পরম উপলব্ধি।

চোখ বলছে, চলো চ'লে যাই, দেখার আর কিছুই নেই,—মন বলছে, চোখ দিয়েই দেখা যায় না,—চোখে দৃশ্য ফুরিয়ে যায়, মনের আবিষ্কার অফুরন্ত। সে আপন খনিতে সোনার চূর্ণ জমিয়ে চলেছে, একদিন খুলবে তার স্বর্ণতোরণ। প্রবাল আপনার জীবন দিয়ে সমুদ্রের গভীর নীচে গাঁথতে থাকে মানবচক্ষুর অন্তরালে, একদিন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য নিয়ে সে সাগরবক্ষে সুন্দরী মৎস্যকন্যার মতো জেগে ওঠে; তেমনি প্রাণসমুদ্রের নীচে থেকে বাণীর শতদল উঠে দাঁড়ায় আপন মহিমা নিয়ে,—চোখে দেখা যায় না তার জন্মবৃত্তান্ত। মনের কাজ মনে মনে, চোখ ব্যস্ত থাকে বহির্দৃশ্যের সমালোচনায়।

একদা আরব সাগরের উপকূলে দ্বারকার মন্দিরের দরজায় এসে পৌঁছানো গেল। সূর্য্যদেব শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রে উদয় হন্, দ্বারকার সমুদ্রে অস্তে নামেন। বিরাটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত প্রাণ হোলো নির্ব্বাক। দিগন্তবিস্তৃত শ্যামরূপ, ললাটে রঙীন মেঘের মোহন চূড়া, লক্ষ নক্ষত্রমণিখচিত,—পদতলে শুভ্র ফেনতরঙ্গ-শতদল, কণ্ঠে জড়ানো বেলাভূমির চম্পকমালা। ভাবলুম, এই বোধহয় ইষ্টদেবতার চরণতল, এর পরে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা নেই, এইখানেই আশ্রয় নেওয়া যাক্।

কোমল বালুময় বিস্তীর্ণ সমুদ্রতল। তটের ধারে ধারে ছোট ছোট কালো পাহাড়, তারই গুহার মধ্যে সাগর-তরঙ্গ ঝাঁপিয়ে প্রবেশ করে। যেন কোন গভীর অর্থ খুঁজতে যায়, ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। প্রাণ পেতে শুয়ে থাকি কোমল বালুশয্যায়,—সাগরের রহস্যময় নিশ্বাস কী যেন ভাষায় ভরা, যেন বিপুল অতৃপ্তির আবেদন। দূর শূন্যলোকে সাদা সিন্ধুপাখীর দল তারই কথা কইতে কইতে চ'লে যায়, তারা যেন জানে সমুদ্রের পুরাকালের ইতিহাস। কবি বলেছেন, 'জানি তোমার সাথে দেখা হবে সাগর কিনারায়!' কা'র সাথে? কে তুমি? কা'কে খুঁজে মরি?

করুণ চক্ষের প্রশ্ন নিয়ে দিনান্তের সূর্য্য বিদায় নেন্। আকাশে আকাশে জাগে তারা। ক্ষীণ-চন্দ্রের প্রতিবিম্ব অথৈ কালো জলে কাঁপতে থাকে। দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে সাগরের উচ্ছ্বাস কী যেন অস্পষ্ট উত্তর দিয়ে চ'লে যায়। দিনের পর দিন কাট্‌ল। ভালো লাগল না। অসীম নির্জ্জনতা পাষাণভারের মতো বুকে চেপে দাঁড়ালো। একদিন রাজপথের অশ্রান্ত লোকযাত্রায় জনতার কোলাহলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালুম। জানলুম, মানুষের ভিতর দিয়েই পরম প্রশ্নের উত্তর পাবো।

স্থির করা গেল, ভেট্-দ্বারকা দেখে আসতে হবে। সেদিন সকাল বেলায় উত্তরগামী ট্রেনে উঠে বসলুম। সমুদ্র দেখে চক্ষু ক্লান্ত। এবার ভালো লাগল সবুজ মাঠ, চাষীর চাষ, ছোট গ্রাম, শিশু ছেলে-মেয়ের অশ্রান্ত কলরব। জীবনের একটা জটিল তত্ত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ফেলে বাঁচলাম।

দ্বারকা থেকে ভেট্ যেতে হ'লে ওখা বন্দর হয়ে যেতে হয়। ওখা পর্য্যন্ত ট্রেণ চলে। বন্দরটি একেবারে আরব সাগরের উপকূলে। উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিমে অগাধ সাগর থৈ থৈ করছে,—পূব দিকে কেবল সঙ্কীর্ণ স্থলরেখা বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে।

করাচি থেকে জাহাজ ছেড়ে ওখায় এসে লাগে, তারপর যায় দ্বারকায়। দ্বারকা থেকে বোম্বাই। ফেরবার সময় জাহাজে বোম্বাই যাবার ইচ্ছা আছে।

ওখার কাছে সমুদ্র একটু বাঁক্ নিয়েছে। ভেট্ যেতে হ'লে সমুদ্র এড়িয়ে আন্দাজ মাইল পঞ্চাশেক ঘুরে যেতে হয়। কিন্তু সে পথ অগম্য। অতএব আড়াআড়ি মাইল কয়েক সমুদ্র ডিঙিয়ে ভেট-এ যাওয়াই স্থির হোলো।

দ্বারকায় থাকতে তিনটি বাঙালী বয়স্কা মহিলা তীর্থযাত্রীর দেখা মিলেছিল। দেবদর্শন-মানসে দূর থেকে তাঁরা এসেছেন একটি ছেলেকে সম্বল ক'রে। ছেলেটির বয়স বছর আঠারো। নাম নিতাই। ওখায় আসতে আর দুটি সঙ্গী জুটলো। হিন্দুস্থানী একজোড়া স্বামী-স্ত্রী।

ডিঙিয়ে যেতে হ'লে ডিঙি চাই। সন্ধ্যার আগে সবাই ফিরবো, এই আন্দাজ ক'রে আমরা সাতটি পুণ্যকামী একখানি 'নাও' ভাড়া ক'রে

সেই উপসাগরটি পার হয়ে গেলাম। সাগরের উপর রোদ অতিরিক্ত প্রখর হয়ে ওঠে, বাতাস নেমে যায়। প্রথম শীতের সমুদ্র এখন শান্ত, নৌকা বেশী দোলে না। দুপুরবেলাকার আকাশ কোমল নীল, তারই নীচে জরি পাড় শাড়ীর মতো বালির চড়াটা দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে আলোয় ও বাতাসে ঝল্‌মল্ করছে। আর এক দিকে কাথিয়াবাড়ের কালো মাটীর উপর বাবলার জঙ্গল কোন্ একটা অস্পষ্ট পর্ব্বতরেখা পর্য্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে গেছে।

সমুদ্রের তীর থেকে উঠেই পথের উপর একটি ছোট্ট ধর্ম্মশালা। অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। দেবমন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে মানুষের সামান্য কয়েকটি বসতি। তা ছাড়া চিনাবাদাম, তুলো এবং এক প্রকারের কাছি তৈরী করাই এদের উপজীবিকা। ঠাকুরদেবতা এবং মন্দিরের নানারকম ছবির দোকানও এখানে কয়েকখানি রয়েছে। ছোট্ট একটি হাট।

এক টাকা ও এক আনা না দিলে এখানে প্রত্যেকের ঠাকুর এবং মন্দির দর্শনের উপায় নেই। দ্বারকা ও ভেট-দ্বারকার এই অনাচার নাকি চিরদিন ধরেই চ'লে আসছে। তীর্থযাত্রীর দেখা এদিকে ক্বচিৎ মেলে, তাই তাদের উপর এ জুলুম না করলে মন্দিররক্ষীদের উদরান্ন চলে না। এতদূরে যারা আসবে এক টাকা এক আনা ক'রে তারা দেবেই—এই তাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের ফলও তারা পায়।

মন্দির দর্শন, প্রদক্ষিণ, পরিক্রমণ, ভ্রমণ, জলযোগ এবং বিশ্রামের পর ঠিক সময় আমরা আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। তখন প্রায় অপরাহ্ণ। পাণ্ডা জানালো, তীর্থের 'সুফল' করতে হবে। এই 'সুফলটি' তাদের খুব বড় উপার্জ্জন। নাম ধাম, বংশপরিচয় ইত্যাদির পর প্রসাদ বিতরণ এবং তার পর রজত মুদ্রা গ্রহণ। তার সমস্ত দাবী মেটাবার পর জানা

গেল, এখানে এক রাত্রি বাস না ক'রে গেল 'সুফল' সফল হয় না! গোঁড়া হিন্দুকুলধ্বজেরা আমার সঙ্গী—বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ তাঁরা রাজি হলেন।

অতএব অপরাহ্ণ চললো সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে, এবং সন্ধ্যা ছুটলো রাত্রির পথে। অপরিচিত জায়গায় রাত্রি অত্যন্ত কষ্টকর। সমুদ্রের আবহাওয়ায় শীত না থাকলেও শয্যা এবং স্থানাভাবে ভারি অসুবিধা-জনক মনে হোলো। প্রথম দিকটা কাটলো সমুদ্রের তীরে নিতাইয়ের সঙ্গে নানা দেশের কাহিনী বিবৃত ক'রে। রেঙ্গুণ পলায়ন ক'রে কি করুণ এবং হাস্যকর অবস্থায় পড়েছিলাম, তার নিখুঁত্ ইতিহাস। রাত দশটার পর ধর্ম্মশালায় ফিরে হিন্দুস্থানী স্বামীটির সঙ্গে গল্প। নিতাইকে সে শেখাতে লাগল, 'লেকিন্' মানে 'কিন্তু', ভান্টা' মানে 'বেগুন' এবং 'গোহরি' মানে 'ঘুঁটে'। অনেক রাতে ধর্ম্মশালার বৃদ্ধ রক্ষী এসে জানালো, রাত তিনটা নাগাৎ এখান থেকে যাত্রা করতে হবে, 'নাও' প্রস্তুত থাকবে সে সময়, তারপর ওপারে গিয়ে ভোর পাঁচটার সময় দ্বারকায় ফেরবার ট্রেণ মিল্‌বে।

দুখানি মাত্র ঘর। একটি ঘরে বৃদ্ধ রক্ষী এবং কয়েকজন মাঝিমাল্লা রাত কাটায়। আর একটি ঘর আমাদের জন্য। আমাদের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর হোলো বিপদ, তাদের আলাদা ঘর কই! এক জন মহিলা বললেন, অত কেন বাছা? একটা রাতের জন্যে তুম্ লোককে আলাদা ঘর না হলেও চলে যায়গা। বলি, ওগো অ ছেলে, তুমিই বুঝিয়ে বলো বাবা, আমরা অত হিড়িমিড়ি বলতেও পারিনে! আ মর্, ছুঁড়ির লজ্জা দেখে আর বাঁচিনে!

যাই হোক, আর কোনো উপায় ছিল না। একই ঘরে তিনটি

পুরুষ ও চারিটি নারীর জায়গা ভাগ ক'রে নিতে হোলো। অবগুণ্ঠনবতী হিন্দুস্থানী মেয়েটি সকলের প্রস্তাবের উপর কোনো কথাই বললে না। অলক্ষ্য কোনো একস্থানে ব'সে কিঞ্চিৎ ছাতু-মিঠাইসহ জলযোগ ক'রে এসে নিঃশব্দে সলজ্জভাবে একটি কোণে জায়গা নিল। স্বামীটি রইল আমাদের সঙ্গে।

বোস-গিন্নী বললেন, ও সব আমার সয়না বাপু···জায়গা আমার একটু বেশী চাই। কি জাত না কি জাত ঠিক নেই, অত ঘেঁষাঘেঁষি ···গন্ধ···রাম বলো! আমি শোবো এইখানে।

নিতাইয়ের মা বললেন, নোংরা ত নয় মা, চেহারাটা ছুঁড়ির ভদ্দরঘরের মেয়ের মতন।

ফুল-মাসি বললেন, একটা রাত বৈ ত নয়! অত মাখামাখি না করলেই হোলো। এই বলে' তিনি সেই তথাকথিত অবজাত (!) মেয়েটির কাছ থেকে একটু গা মেরে আড় হয়ে শুলেন।

সবাই যাকে ঘৃণা করল, সে-ই রইল আরামে। মেয়েটি পরমানন্দে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রা যেতে লাগল।

বোস-গিন্নী এক সময় বিরক্ত হয়ে বললেন, আবাগির নাক-ডাকার শব্দে চোখের পাতা বোজাবার উপায় নেই! এক কাঁড়ি ছাতু গিলে শুয়েছে, ওলাউঠোর ভয় করে না! খ্যাংরা মারো অমন খাওয়ার মুখে···ইত্যিজাতের ছায়া মাড়াতে নেই!

নিতাইয়ের মা বললেন, কাঁচা বয়সের ঘুম কিনা···বেহুঁস্!

ফুল-মাসি বললেন, এমন লজ্জা কিন্তু দেখিনি দিদি, আমাদের কাছেও ঘোমটা তুললো না!

বোস-গিন্নী বললেন, ছোটজাতের সবই বিটকেল্! আধিক্যেতা —অত লজ্জা বলেই অত নষ্ট ওদের জাত।

এই অপূর্ব্ব আলাপের ভিতর দিয়ে রাত তিনটে বাজলো। সবাই তৎপর হয়ে উঠলাম। মোটঘাট, পুঁটুলি কিছুই সঙ্গে ছিল না। খবর এলো 'নাও' প্রস্তুত। স্বামী-স্ত্রী আবার এক হয়ে গেল। বোস-গিন্নীর দেহখানি কিঞ্চিৎ স্থূল। রাত জেগে তাঁর মেজাজটাও তেমন ভালো ছিল না। কিন্তু তাঁর রাগটা গিয়ে পড়ল বিদেশিনী মেয়েটির উপর! দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, আ মর! মাদ্দি ঘোড়ার মতন ছুটছে! তোর মতন ত' সবার পা নয় আবাগি, ফর ফর ক'রে চলছিস্। আমাকে ঠাট্টা ক'রে সব এগিয়ে চললো···চোখের মাথা খা। অ নিতাই, হাতটা একবার ধর বাবা···যে হাওয়া বাছা, পরণের কাপড়খানাই সাম্‌লানো দায়···বলি অ ফুলু?

এমনি চেঁচামেচি করতে করতে তিনি বৃদ্ধা রাজহাঁসের মতো সমুদ্র তীরে এলেন। আমায় যে কষ্ট তোমরা দিলে, দেশে হ'লে আমি 'নালিশ' করতুম! ঘুঘুর ফাঁদে পড়তে! আমি বাবা উকিলের পরিবার, অল্পে ছাড়তুম না।

চড়া থেকে নেমে জলের মধ্যে হাঁটু পর্য্যন্ত গিয়ে তবে নাও-এ উঠতে হবে। শেষ রাত্রে জল ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠেছিল। বাতাসের বেগে নাকের নিশ্বাস পর্য্যন্ত আটকে যায়। বোস-গিন্নী হাঁপাচ্ছিলেন। তাঁকে ধরাধরি ক'রে অনেক কষ্টে নৌকায় তুলতে হলো। তারপর আমরা সবাই উঠলাম। একজন মাত্র মাঝি, পালের জোরে নাও চলবে।

আলোটা নিয়ে বৃদ্ধ রক্ষী যখন চ'লে গেল তখন সমুদ্রের দিকে

তাকিয়ে বোস-গিন্নীর মুখের কথা থেমে গেল। দিকচিহ্নহীন সাগরের উপর মসীকৃষ্ণ রাত্রি থম্ থম্ করছে! ঢেউয়ের উপর ঢেউ প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ে' নিশ্বাস ফেলে যাচ্ছে। সবাই জানে রাত্রিশেষে সমুদ্রের উপর একটি স্বাভাবিক ঝড় দেখা দেয়।

মহিলারা তিনজন বসলেন সুমুখের দিকে। মাঝামাঝি বসলো স্বামী-স্ত্রী। তাদের পিছন দিকে এই অধম বসলো। নিতাই রইল ওঁদের কাছে।

কথা উঠল, কে কে সাঁতার জানে! ফুলমাসী পল্লীগ্রামের মেয়ে, তিনি সাঁতার জানতেন। নিতাই জানালো, সে জানে না। হিন্দুস্থানী পুরুষটি সমুদ্রের দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এদিকে ফিরে আমায় বললে, সে একবার শেখার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জলে নামলেই তার ভয় করে। সে একা কখনো নদীতে স্নান করতে যায় না!

বোস-গিন্নী কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সাঁতাব জানো বাবা?

অকপটে বললাম, জানি বৈকি······বাংলা দেশের ছেলে হয়ে,—কত নদী হাসতে হাসতে পার হয়েছি! খুব ভালো সাঁতার জানি।

নৌকা আমাদের গভীরের দিকে এগোতে লাগ্‌ল। অন্ধকারে তীরের অস্পষ্ট ছায়াটাও গেল সবার চোখ থেকে মুছে। নৌকা দুল্‌ছে না, যুদ্ধের ঘোড়ার মতো ক্ষিপ্র হয়ে সুমুখের দিকে লাফাতে শুরু করেছে। কোথাও আলো নেই, কুল-কিনারা নেই—জল, জল, আর জল! ঢেউ ভেঙে জলের ছাট্ মাঝে মাঝে গায়ের উপর এসে লাগছে। মনে হোলো, আজ আমরা সত্যি বিপদের মধ্যে এসেছি।

ভয় পাবারই কথা ; ফুলমাসী দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। নিতাইয়ের মা নিতাইকে চেপে ধরে' কাঠ হয়ে ছিলেন। বোসগিন্নী জড়িত কণ্ঠে বিপদ্‌তারণ মধুসূদনকে ডাকছিলেন। প্রাণভয়ে ভীত তাঁদের মুহুর্মুহুঃ আর্ত্তনাদ শুনে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'তে লাগল। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাগলের মতো লক্ষ লক্ষ জিহ্বায় শাসন করতে শুরু করেছে। অগণন-নক্ষত্রখচিত আকাশ বায়ুতাড়িত-চাঁদোয়ার মতো আলুথালু হয়ে দুলছে। মৃত্যুকে এড়াবার আজ আর কোনো উপায় নেই!

দেখতে দেখতে হিন্দুস্থানী পুরুষটি মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে বমি করতে শুরু করল। নৌকার মধ্যে স্ত্রীর পা দুটো জড়িয়ে উপুড় হয়ে তার বমিও থামে না, উঠেও বসে না। ওদিকে বোস-গিন্নী নিতাইয়ের মা'র কাঁধে মুখ গুঁজে মাঝে মাঝে অক্‌ ক'রে বমি তুল্‌ছিলেন। ফুলমাসী থেকে থেকে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ছেন।

'পানি পাগ্‌লা হো গিয়া বাবুজি, সামাল্‌কে বৈঠো।'

মাঝির সঙ্কেত শুনে গা ছম্‌ছম্‌ ক'রে উঠ্‌লো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার মনে হোলো, জীবনের মূল্য কত বড়! মৃত্যু সহজ নয় —মৃত্যু ভয়ঙ্কর! চারিদিকে ভয়ার্ত্ত চোখে একবার শেষ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। পৃথিবী কোথায়? কোথায় শস্যশ্যামল স্থল-রেখা? উন্মত্ত জলরাশি আর দোলায়মান আকাশ ছাড়া আর কোথাও যে কিছু নেই! তবে কি শুধু অসহায় হয়ে মরতে হবে? সাঁতার ত' এতটুকু জানিনে, —তখন যে মিথ্যা কথাই বলেছি! যাবার সময় মিথ্যা কথা ব'লে কেন নিজেকে অপমান ক'রে গেলাম?

হু হু হু হু,—ঝপ্‌ ঝপাৎ! বড় একটা ঢেউয়ের আধখানা ভেঙে

পড়লো নাও-এর মধ্যে। এক মুহূর্ত্তে ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে উঠলো। ডাকলাম, নিতাই ?

নিতাই চোখ বুজে কাৎ হ'য়ে ব'সে আছে, সাড়া দিল না। বোস-গিন্নী একবার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন, আমি আসতে চাইনি, মরতে চাইনি, আমার পুণ্যির দরকার ছিল না···দোহাই মধুসূদন···চেতনা হয়ত' ছিল না, তবু নিঃসাড় হয়ে বসে' বসে' অনুভব করলাম, একখানি হাত ধীরে ধীরে আমার পায়ের উপর দিয়ে উঠে এসে খুঁজে খুঁজে আমার ডান্ হাতখানা সাপের মতো আঁকড়ে ধরল। হাতখানি উষ্ণ, ঘর্ম্মাক্ত, কিন্তু কোমল। সেদিকে যে ফিরে তাকাব এমন সময় ছিল না, যে-কোন মুহূর্ত্তে 'নাও' ওল্টাতে পারে। সে-হাতখানি নির্ব্বাক ভাষায় যেন বল্‌লে, সবাই যাক্, আমি কিন্তু বাঁচতে চাই ! মৃত্যুর অতল তলে এত সহজে আমাকে তলিয়ে যেতে দিয়ো না ! তুমি অনেক নদী পার হয়েছ ! তুমি সাঁতার জানো।

অতীত জীবনের অসংখ্য ছোট বড় ঘটনাগুলির মধ্যে ডুব দিয়ে দেখলাম, আজ অবধি এমন কোনো নারীরই দেখা পাইনি যে আমাকে আশ্রয় ক'রে বাঁচতে চেয়েছে ! আমি বাঁচাতে পারি এত বড় ধারণা যে নারীর—সে আমাকে গৌরবান্বিতই করেছে ! সে যে এই ভয়ানক বিপদের মধ্যে শুধু নিজের প্রাণটাই বাঁচাতে চাইল, এতে তাকে স্বার্থপর বলিনে। যুগে যুগে অবলীলাক্রমে পুরুষ করেছে মৃত্যুর কাছে আত্মদান,—কিন্তু তার চেয়েও যে বড় কথা,—নারী মরতে চায়নি, সে ভালবেসেছে জীবনকে, সে মমতা করেছে এই সুন্দর পৃথিবীকে, এই বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য আকণ্ঠ পান ক'রে সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। শুষ্ক, রূঢ়, নিরুদ্দেশ মৃত্যুকে সে চিরদিন এড়িয়ে চলেছে !

কিন্তু হায়, এই যে আকাশ-পাতাল পরিব্যাপ্ত ক'রে মরণ এসে তার বিরাট রূপ নিয়ে চোখের সুমুখে দাঁড়ালো, এর করাল গ্রাস থেকে এই বালিকাকে বাঁচাই কেমন ক'রে? একটি নারীর জীবনকে রক্ষা করতে যে বহু যুগের সাধনার দরকার!

স্বামীটি প'ড়ে রয়েছে নৌকার মধ্যে অর্দ্ধমৃতের মতো। অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। কিন্তু মেয়েটি আর পারল না, পিছন দিকে কাৎ হয়ে আমার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পুরুষের কাছে তার আবেদন। পুরুষ, তুমি আমাকে বাঁচাও। একটি ব্যাকুল প্রার্থনায় ঝর ঝর ক'রে তার চোখ দিয়ে জল নেমে এসেছিল।

কোন উপায়ই ছিল না, ভুলে যেতে হোলো যে সে পরস্ত্রী! কোলের কাপড় চোপড় তার বমিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল! কোঁচার খুঁটে মুখখানি মুছিয়ে দিয়ে হেঁট হয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দি ভাষায় বিদেশিনীর কানে কানে বললাম, সমুদ্রে যাতায়াত যাদের অভ্যাস নেই তাদের এমন হয়েই থাকে!

কিন্তু তার লজ্জাও যেমন আর ছিল না, কোনো সান্ত্বনাই তেমনি তার কানে গেল না! আধখানা দেহ দিয়ে সে আমাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে রইল।

দেখতে দেখতে পূর্ব্ব দিগন্তে রক্তলেখা দেখা দিল। সমস্ত আকাশটায় একটু একটু ক'রে রং ধরতে লাগল। দু'তিনটি জ্যোতি-

ম্লান্ তারকা তখনো দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে। তারই নীচে অস্পষ্ট পৃথিবীর রেখা দৃষ্টিপথে জেগে উঠলো।

কতক্ষণ এমনি ক'রে মেয়েটিকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসেছিলাম জানিনে, চমক হতেই চেয়ে দেখি নৌকার অসংযত উৎশৃঙ্খলতা শান্ত হয়ে গেছে। ওপারে বালির চড়ায় সূর্য্যোদয়ের আভাস লেগেছে!

তীরের কাছাকাছি আসতেই সবাইয়ের দেহে প্রাণ ফিরে এলো। মেয়েটিকে তুলে সোজা ক'রে বসিয়ে দিতেই সে তাড়াতাড়ি আবার আপাদমস্তক ঘোমটা টেনে দিল। এদিকে বোস-গিন্নী প্রমুখ মহিলারা এবং নিতাই কাঁপতে কাঁপতে সোজা হয়ে ব'সে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন। তাঁরা যে সকলেই বেঁচে আছেন, এ বিশ্বাস তখনো তাঁদের ফেরেনি।

'নাও' এসে তীরে ভিড়তেই বোসগিন্নী আনন্দে একবার চীৎকার ক'রে উঠলেন। সর্ব্বাগ্রে তাঁকে ধরাধরি ক'রে নামাতে হোলো, তারপর নিতাই, তার মা ও ফুলমাসি। পরিশেষে হিন্দুস্থানী স্বামীটি স্ত্রীর একটি হাত ধ'রে ও আর-একটি হাতে তার কোমর জড়িয়ে পরম যত্নে ও গভীর মমতায় নামিয়ে নিলেন।

দূরে বনরেখার মাথায় তখন রাঙা সূর্য্যের উদয় হয়েছে। আস্তে আস্তে জলে নেমে গিয়ে কাপড়খানা কেচে শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এলাম।

বিদেশিনী অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে একবার ফিরেও তাকালো না। এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অদূরে স্বামীর সঙ্গে উচ্ছ্বসিত আনন্দে কথা ব'লে চলেছে। অলক্ষ্যে যে ঘটনা ঘটে গেছে, প্রকাশ্যে সেটি

লজ্জার কথা সন্দেহ নেই। ঘণ্টাখানেক আগেকার দুঃস্বপ্নের জন্য সে যদি অনুশোচনা করে তাতেই বা বিস্মিত হবার কী আছে?

সবাই এগিয়ে যেতে লাগল। কিয়ৎক্ষণ পরে জানা গেল, স্বামী-স্ত্রী এ গাড়ীতে ফিরবে না। আমি বললাম, বেশ ত, আমিও ফিরবো পরের গাড়ীতে, এক সঙ্গেই—

কিন্তু দুনিয়ার গতি অত সহজ নয়। ট্রেণ ছাড়বার সময় স্বামীটি একবার এসে জানিয়ে গেল, তারা এই ট্রেণেই চল্‌লো, আমি যেন কিছু মনে না করি।

আমি যেন তাদের পথের ভয়ানক বাধা। বিদেশিনী আমাকে এড়াতে পারলে যেন বাঁচে! সঙ্গে যাব না শুনে মহিলারা একটু দুঃখিত হলেন,—এ যে চারিদিকে সমুদ্দুর, কোথায় থাকবে বাবা?

ট্রেণ ছেড়ে দিল।

ভিজা কাপড়খানি আমার হাওয়ায় ততক্ষণে শুকিয়ে উঠেছে। জামার পকেটে পয়সাগুলি একবার অনুভব ক'রে নিলাম। তারপর বালি ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চললাম দূরে একটা কফিখানার দিকে। জাহাজঘাটার খালাসিরা সেখানে ভিড় করেছে। সমুদ্রের পথ দিয়েই বোম্বাইয়ের দিকে পাড়ি দেবো।

——

'তুমি জানো ওগো অন্তর্যামী
পথে পথে মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধ্‌লো নাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা।'

শীতের কোনো এক রাত্রে সবান্ধবে সাঁওতাল পরগণার ভিতর দিয়ে চলেছি। ট্রেণে ভিড়, পা ছড়িয়ে শোবার জায়গা নেই। দীর্ঘ পথ, চোখে আসছে তন্দ্রা। যে বেশি ঘুমোয় তার চরিত্রটা স্থূল; যার কথায় কথায় তন্দ্রা তার পরিচয় গভীরের সঙ্গে। তবু চেতনার পলতেটাকে উস্কে-উস্কে জ্বালিয়ে রেখেছি।

শীতকালের শেষ রাত। ঠাণ্ডা খুব। বাইরে হিমাচ্ছন্ন আকাশ, ভোর রাত্রির অস্পষ্ট অন্ধকার, তবু কোথায় ভৈরবীর আলাপ সুরু হয়েছে।

আমাদের দেশের প্রভাতকাল চিমনীর ধোঁয়ায় আর কলের বাঁশীতে ক্ষত-বিক্ষত ও কলঙ্কিত হয় না,—সঙ্গীতে, পূজায়, প্রার্থনায় এদেশে প্রভাতকে বন্দনা করে' ঘরে ডেকে আনে। প্রভাত থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত দিনমানটাকে ও-দেশের লোকেরা কাজের যন্ত্রে ফেলে তাকে শোষণ ক'রে নেয়, আমরা সূর্য্যের স্তব থেকে সন্ধ্যারতি দিয়ে তাকে শেষ করি।

সূর্য্যোদয় হয়েছে। দু'ধারে অসমতল জমির ভিতর দিয়ে গাড়ী চলেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে ধূম্রবর্ণের পাহাড়। প্রান্তরের উপর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত নানা-আকৃতির বাংলো, তার কোলে কোলে ছোট ছোট লাল সুরকির রাস্তা মাঠের ঘাসের মধ্যে মিলিয়ে গেছে।

জামতাড়ায় এসে যখন নামলাম তখন বেলা হয়েছে। ষ্টেশন প্রায় জনহীন। নামলাম শুধু আমরাই দুজনে। এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে দু'তিনটি লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, কোথা থেকে আসছেন ভাই আপনারা? কোথা যাবেন? Whom do you want?

বৃদ্ধের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। পরণে হাফপ্যাণ্ট, হাতে বর্ম্মা চুরুট, মুখের উপর প্রকাণ্ড একজোড়া সাদা গোঁফ। গলার আওয়াজ স্থূল এবং কর্কশ ব'লে প্রথমেই মনে হ'তে পারে। বললাম— এখানকার ষ্টেশন মাষ্টারের নাম কি প্রফুল্লবাবু?

—ওই নাও হে মাষ্টার, তোমার মক্কেল! দেখলে ভাই, দেখলে, ভাগ্যি তোমাদের জিজ্ঞেস করলাম, ভাগ্যি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম— এবার আমায় মেনি থ্যাঙ্কস্ দিতেই হবে! যদি না দাও তবে, হে বীরচুড়ামণি, ক্ষাত্রসনে করিতেছ রণ, কালি যুদ্ধে তোমারে বধিব, এই মানি প্রতিজ্ঞা আমার!

এক মিনিটের পরিচয়, তবু বৃদ্ধের অভিনয় দেখে সবাই হেসে উঠলাম। বৃদ্ধ আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না ক'রে মার্চ্চ করতে করতে চলে গেলেন। স্বয়ং প্রফুল্লবাবুকে পেয়ে বললাম, আপনার ভগ্নি আমাকে চেনেন, গত বছর প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গিয়ে তিনি ভারি অসুবিধায় পড়েছিলেন, সেই সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয়।

মাষ্টার মশাইয়ের মুখ আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরমাত্মীয়ের মতো তিনি পিঠের উপর হাত রেখে বললেন, আপনিই? আপনিই তাঁদের পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন?

বললাম, সে সময়ে আমার এক বন্ধুও ছিলেন, তাঁর নাম শঙ্কর।

ষ্টেশনের কাছেই বাসা। তৎক্ষণাৎ সেখানে খবর হয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ এলেন, বৃদ্ধা এলেন, মাসীমা এলেন। ওঘর থেকে বিধবা দিদি এলেন দৌড়ে। বৌ-ঝি ছেলেমেয়ে সবাই ছুটে বেরিয়ে এল।

—তুমি দীর্ঘজীবী হও বাবা, চিরজীবন ধ'রে মানুষের তুমি এমনি উপকার করো। বড় দুর্দ্দিনে তুমি আমাদের রক্ষে করেছিলে।··· সর্ব্বস্ব চুরি হয়ে গেল, নিরুপায় হয়ে রাস্তার ধারে বসেছিলাম, ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছিলেন, কত যত্ন আমাদের করেছিলে, সারা বছর ধ'রে আমরা তোমাদের নাম করেছি···

দিদি বললেন, রাজা হও ভাই, তোমার মতন ছেলে,······সব মনে পড়েছে,—মাঘ মাসের দিনে প্রয়াগের শীতে বিছানাটি পর্য্যন্ত আমাদের ছেড়ে দিয়েছিলে! নাও, জামা ছাড়ো ভাই। যদি ভালো ক'রে যত্ন করতে না পারি ত নিজের গুণে মানিয়ে নিয়ো।

দিদি হাসিমুখে ভিতরে গেলেন। সামান্য কর্ত্তব্যকে মানুষ যখন বৃহৎ উপকার ব'লে গ্রহণ করে তখন পৃথিবীর দুর্দ্দিন এসেছে বলতে হবে। মানুষের কাছে মানুষের যে স্বাভাবিক দাবী, যে অধিকার, তার কথা যে প্রয়াগের সেই লক্ষ লক্ষ জন-জটলার কোলাহলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এঁদের দুর্দ্দশার দিকে তাকিয়ে স্মরণ করতে পেরেছিলাম, এজন্য এই পরিবারটির কাছে আমিই কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ-তত্ত্ব তখন শোনাব কা'কে? বিপুল অভ্যর্থনার স্রোতে আমার বিনয় সৌজন্য সব ভেসে গেল!

মাষ্টার মশাইকে বললাম, তিনি এখানে আছেন ত? সেই সন্ন্যাসিনীটি? তাঁর আশ্রম কতদূর এখান থেকে?

প্রফুল্লবাবু বললেন, নিয়ে যাবো আপনাকে, আগে খাওয়া-দাওয়া হোক।

সারাদিন বিশ্রামের পর অপরাহ্নের দিকে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল। জাম্‌তাড়া ছোট জায়গা, ষ্টেশনের ওপারে কয়েকখানা পাকা ঘর, গুটিকয়েক দোকান—নিত্যপ্রয়োজনের সামগ্রী ছাড়া সেখানে আর কোনো বৈচিত্র্য নেই। কিয়দ্দূরে পালেদের প্রকাণ্ড প্রাসাদবাটী। এপারে এক বোসেদের বাগানবাড়ী ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোনো বাসিন্দার সমাগম দেখা যায় না। এছাড়া সরকারী ডাক্তার আছেন, তাঁর নাম গাঙ্গুলী সাহেব,—তিনি আমাদের পূর্ব্বোক্ত রসিক বৃদ্ধ।

জল হাওয়া খুব ভালো, অল্প সময়ের মধ্যে তার পরিচয় পেলাম। প্রফুল্লবাবু তাঁর চাকুরি জীবনের নানা গল্প করে' চলেছেন। তিনি মধুর প্রকৃতির লোক, ভগবৎভক্ত। চওড়া একটা পাকা রাস্তা দিয়ে চলেছি, দুধারে মাঠ—পথ নিরিবিলি। ক্বচিৎ দু'একজন সাঁওতালি মেয়ে পুরুষ ছাড়া আর কোনো লোক চোখে পড়ে না। রুক্ষ বাতাস পথে-পথে গাছে-গাছে ব'য়ে চলেছে। শীতের সূর্য্য দূর প্রান্তরের পারে এইবার অস্তে নাম্‌ল।

পথ ছেড়ে মাঠে পড়লাম। অবারিত মাঠ। নিকটে ও দূরে চাষ-আবাদের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রক্তিম দিগন্তের একান্তে সন্ধ্যা আসছে নেমে। মাষ্টার মশায়ের নির্দ্দেশক্রমে আমরা নব প্রতিষ্ঠিত মাতৃ-আশ্রমের দরজায় এসে উঠলাম।

জীবনে যার বহু বৈচিত্র্য, ঘাত প্রতিঘাত, অনেক ঘটনার দাগ তার মন থেকে মিলিয়ে যায়। পথের জনতার মধ্যে যার সঙ্গে ক্ষণিক পরিচয়, বহুদিন পরে গৃহপ্রাচীরের অন্দরে তাকে চেনা একটু

কঠিন। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর কাছে যখন গিয়ে দাঁড়ালাম তিনি তাঁর স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বললেন, চিনতে পেরেছি, ভুলতে পারিনি। আসুন, আসুন—আরে, আপনার কথা নিয়ে আমাদের কতদিন কেটেছে। কই হেমন্ত-মা, এধারে একটা আসন দিয়ে যান্ ত, এই দেখুন কে এসেছেন। উনি আপনার বন্ধু বুঝি? আসুন, উঠে আসুন।—

মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দুই বন্ধু আসন গ্রহণ করলাম। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়হীন প্রান্তর, কোথাও কোথাও অস্পষ্ট এক একখানি সাঁওতালি গ্রাম, মাঝে মাঝে ছোট শাল-সুঁদ্রীর জঙ্গল, দূরান্তরে আকাশের কিনারায় নামহীন কালো কালো পাহাড়ের ধ্যানমূর্ত্তি, নিকটে কোথাও কোথাও শীর্ণ শুষ্ক জলাশয়—এমনি পারিপার্শ্বিকের মাঝখানে এই ব্রহ্মচারিণীর আশ্রম। ভিতরে অল্পবয়স্কা কয়েকটি মেয়ে আলোর কাছে ব'সে শিল্প ও সূচীকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। সকলেরই পরণে গেরুয়া বা বাসন্তী রংয়ের পরিচ্ছদ। একটি রং যৌবনের, আর একটি ত্যাগের। যে বড় ঘরটিতে পূজা, জপতপ হয় সেখানে এসে বসলাম। রাধাকৃষ্ণ এবং নারায়ণের মৃত্তিকা-মূর্ত্তি একধারে সাজানো। এই মূর্ত্তিগুলি অবলম্বন ক'রে এদের ব্রত, পূজা, সাধনা যা কিছু।

বাইরে শীতের হাওয়া শুক্‌নো গাছের ডালপালায় বয়ে চলেছে। দূরে কোথায় ট্রেণের ইঞ্জিনের আওয়াজ এইমাত্র নিশ্বাস ফেলে মিলিয়ে গেল। তাঁর আর-এক সঙ্গিনীকে নিয়ে এসে ব্রহ্মচারিণী বসলেন। তপঃশীর্ণ কৃশ দেহ, বয়স বোধ করি তাঁর ত্রিশের কাছাকাছি, ঘন কালো কোঁকড়ান চুলগুলি তাঁর পুরুষের মতো ক'রে ছাঁটা, সুন্দর দুটি দীর্ঘায়ত

চোখে অতলস্পর্শী গভীরতা। নাম চিন্ময়ী। তাঁর সমবয়স্কা সঙ্গিনীটি ওপাশে এসে বসলেন। তাঁরও রুক্ষ রাশীকৃত এলানো চুল, চোখ দুটি কটা, তেজোব্যঞ্জক তাঁর যৌবন, গৈরিক আবরণের মধ্যে যেন অগ্নিশিখা। তাঁদের প্রথম দর্শনেই মন শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে।

রবিন বললে, আচ্ছা আপনাদের এই আশ্রমের গোড়াকার কথাটা কি ?

চিন্ময়ী তাঁর বীণানিন্দিত কণ্ঠে বললেন, দেখুন পুরুষের অনেক সুবিধা আছে, কিন্তু মেয়েদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্থান আজ কোথাও নেই। না কোনো মঠ, না আশ্রম। এ প্রতিষ্ঠান ছোট কিন্তু এর আদর্শ অনেক বড়। মেয়েদের দিয়ে সত্যকারের দেশের কিছু কাজ করাতে হ'লে তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার অনেকখানি দরকার। আত্ম-বিশ্বাস আর দৃঢ়তাই চরিত্রের আসল কথা। শক্তির অধিকারিণী হ'তে গেলে শিক্ষার চেয়ে তপস্যার দরকার। আমাদের এই আশ্রমকে বিদ্যালয় বলিনে, মন্দিরই বলবো।

রবিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে, আপনার এই চেষ্টা এ যুগে ভারতে বোধ হয় এই প্রথম। দেশের নারী-জাগরণের যে সাড়া এসেছে, এই সময় যদি আপনারা দেশে, সমাজে, রাজনীতিতে কয়েকটি চরিত্রকে নামিয়ে দিতে পারেন তা হ'লে দেশের উপকার করা হবে।

চিন্ময়ী মৃদুকণ্ঠে বললেন, রাজনীতির চেয়ে জীবনের নীতিই বড়। দেশে আমরা কোনো উগ্র ঝঞ্ঝা, কোলাহল, বিশৃঙ্খলা আনতে চাইনে, আমরা জীবনকে সৌন্দর্য্যের, আনন্দের, ভগবৎভাবের লীলা-নিকেতন ক'রে তোলার স্বপ্ন দেখছি। নিভৃত সাধনা দিয়ে দেশের মাটীতে যদি শক্তির বীজ ছড়াতে পারি তাতেই আমাদের আশ্রম সার্থক হবে।—

সন্ন্যাসিনী আবার হেসে বললেন, মুখের কথা ব'লে আপনাদের বোঝাতে চাইনে।

রবিন বললে, কেমন ক'রে আপনাদের চলে ?

চিন্ময়ী বললেন, সঞ্চয় ত কিছু নেই, ভিক্ষা ক'রেই চলেছে। মেয়েরাই এদিক ওদিক থেকে আপনাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রে আনে! আপনাদের বলা রইল, যদি কোনো মহাপ্রাণ দাতা পান্ তাঁকে আমাদের কথা জানাবেন। বিশ্বাস ক'রে যিনি সামান্য ভিক্ষাও আমাদের দেবেন, আমরা সেইটুকুই মাথা পেতে নেবো। জীবিকা সমস্যা বড় হ'লে আমাদের আদর্শ মলিন হ'তে পারে।

মনে হোলো, দেশে নারীর আধ্যাত্মিক শক্তির যে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে এর মূল্য কম নয়। কে জানে, এ একদিন মহীরুহের আকার নিতে পারে। নারীর নিভৃত তপশ্চর্য্যার এই তীর্থ, ধর্ম্মের নামে অনাচার-দুষ্ট এই দেশে সহসা চোখে পড়ে না। জামতাড়ার এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি যদি অনুকুল বাতাস পায় তাহলে ভারতের নারীর গৌরবের পীঠস্থান ব'লে গণ্য হ'তে পারে। জীবনের উচ্চ আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, সংসারের স্পৃহা, ঐশ্বর্য্যের মোহ,—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে মেয়েদের এই নিভৃত নিস্পৃহ শক্তি সাধনা,—একে তুচ্ছ বলতে সাহস নেই। আর্থিক দৈন্য সইতে না পেরে এ যদি নষ্ট হয় তা হ'লে সে লজ্জা লুকোবো কেমন ক'রে ?

সেদিনকার মতো আমরা বিদায় নিলাম। রাত্রির অন্ধকারে মাঠ পার হ'য়ে ফিরে আসবার সময় শুধু এই কথাটিই বারবার মনে হ'তে লাগল, এদের ত সবই ছিল, এরা ত সবই পেতে পারত তবু এমন ক'রে

এরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে চ'লে এল কিসের টানে! কী আশায়! কোন্ ব্যাকুলতায়?

জামতাড়া থেকে মধুপুর। মধুপুরে গিয়ে দুদিন কাটল। রেল লাইনের ধারে একটি নোংরা বস্তির মধ্যে এক মুসলমানের কাফিখানায় কোনো সনাতনপন্থী হিন্দু প্রচারকের সঙ্গে দেখা। প্রথমে চেনা যায়নি। একমুখ দাড়ি-গোঁফ, চোখে চশমা, পরণে লুঙ্গির মতো কাপড়, আপাদ-মস্তক আবৃত ক'রে তিনি চা পান করছিলেন। হঠাৎ পরিচয়। তিনি বললেন, মধুপুরে এলেন কেন? রামোঃ দেখবারও কিছু নেই, জানবারও কিছু পাবেন না।—এই ব'লে তিনি তাঁর নিজের কথা পাড়লেন,—উদারতাই ধর্ম্মের গোড়াকার কথা। মুসলমান আমাদের ভাই। বিশ্বাসেই ভগবান। সাধনার পথে গুরু চাই। সংসারে শত তুচ্ছতার মধ্যে থেকে আত্ম-অপমান করতে চাইনে। আমি বিবাহ করিনি মশাই, রোগ হ'লে আমি অমনি ওযুধ বিলোই। এই এগারো বছর মধুপুরে কাটালাম এই ক'রে। মহারাজজি ব'লে সবাই আমাকে এখানে চেনে। সব জাতের সঙ্গে মিশি ব'লে এখানকার বাঙালীরা আমাকে সইতে পারেন না। নীতিবাগীশের অত্যাচারে দেশটা উচ্ছন্নে গেল মশাই।

মধুপুর থেকে গিরিডি। এখানকার জলহাওয়ার গুণে ময়রার দোকানে ভিড় লেগেই আছে। গিরিডির বারগাণ্ডাই আকর্ষণ। পল্লীটি ব্রাহ্ম পরিবারদের একচেটে। ফটক, বাগান আর একটি ক'রে

বাংলো। বাগানে নানা জাতের ফুলের গাছ। প্রত্যেকটি বাড়ীতেই একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানা। নারীকণ্ঠের দূরশ্রুত সঙ্গীতের রেশ,—অথচ একটি শান্ত, কোলাহলহীন পরিবেশ। এদিক ওদিক চেয়ে মনে হোলো, ব্রাহ্ম পরিবারদের মধ্যে অবিবাহিত কন্যার সংখ্যা কিছু বেশী। এঁদের শিক্ষাদীক্ষা অনুযায়ী পাত্র সহসা খুঁজে পাওয়া বোধ হয় একটু কঠিন।

গিরিডি গেলেই উশ্রী জলপ্রপাত দেখে আসা চাই। সাড়ে তিন টাকা ভাড়ায় মোটরে যাওয়া গেল। রাস্তা প্রায় চার ক্রোশ। শহর থেকে বহুদূরে মাঠের মাঝখানে যেখানে গিয়ে নামালো তার কাছেই শালের জঙ্গল। এদিকে ডুমকা, ওদিকে পরেশনাথের পাহাড়। আমরাও নিতান্ত সমতল ভূমিতে নেই! যে-শালবনের পথ আমাদের জন্য নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া হোলো, সে-বন পাহাড়ের সানুদেশে। শালবনের মধ্যে ঢুকে আমরা পায়ে-চলা পথের অস্পষ্ট চিহ্ন আবিষ্কার ক'রে ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলাম। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে আমাদের বোঝা কঠিন হোলো, কোন্ পথ কোন্ দিকে গেছে। একটু একটু ক'রে পায়ে চলার চিহ্ন মিলিয়ে এল। অগাধ অরণ্যের মধ্যে দিশেহারা হওয়ায় আনন্দ আছে, কিন্তু সে-আনন্দ উপন্যাসের। রবিনকে বললাম, ওই ত কয়েকজন সাঁওতালি মেয়ে দেখা যাচ্ছে, একজনকে কিছু পয়সা দিলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় না?

মদীয় বন্ধু রবীন্দ্রনাথের গাত্রচর্ম্মের যে-রঙ তার সঙ্গে সাঁওতালি নরনারীর দেহের রঙের একটি সহজ ঐক্য আছে। তবু সাঁওতালি পথ-নির্দ্দেশিকার নাম শুনে তাঁর কালো মুখখানি কি জানি কি কারণে আরক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ছি!

বললাম, কেন, লজ্জা কিসের? বরং এই নারী-প্রগতির দিনে—

রবীন্দ্রনাথ বললেন, পথ আমরা নিজেরাই দেখে নিতে পারবো। সামান্য পথ চেনবার জন্যে ওকে পয়সা দিতে পারিনে। এসো।

তা বটে। এগিয়ে চললাম। দুধারে জঙ্গল, মাঝখানে সরু একটি মানুষের যাবার মতো অন্ধকার গুহার ন্যায় পথ। একটি ঘন অপরিচিত বনের গন্ধ নেশার মত পেয়ে বসেছিল। যত গভীরই হোক, না গিয়ে ফিরে আসার চেষ্টা করা বৃথা। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দূরে কোথায় জলের শব্দ শুনতে পেলাম। হাঁ, জলপ্রপাতই বটে। তিনটি পাহাড়ের মুখ একত্র হয়েছে। কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট পার্ব্বত্য পথ দিয়ে দুরন্ত দুর্ব্বার জলস্রোত নেমে এসে ভীষণ গর্জ্জনে নীচের দিকে আছড়ে পড়ছে। সে জলস্রোতকে স্পর্শ করবার দুঃসাহসিকতায় বড় বড় পাথরের স্তূপ পার হ'য়ে চলেছিলাম। প্রপাতের ঠিক নীচে একটি স্বচ্ছ নীল নদীর জন্ম হচ্ছে। মাথার উপরে বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকে পর্ব্বত চূড়ায় শালবনের প্রাচীর। নীচের দিকে চেয়ে এগোচ্ছি। হঠাৎ যিনি পথরোধ করলেন তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তিনি মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র উমা-প্রসাদ। ভানুমতীর খেল্ নাকি! বললাম, এই যে কাল আপনাকে মধুপুরের পথে দেখে এলাম। তিনি বললেন, আপনি ফিরবেন ব'লে সেই পথে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আপনি যে পথে যান্ সে পথে বুঝি আর ফেরেন না? বিচিত্র লোক যাহোক!—দুজনেই হাসলাম। বললাম, কখন এলেন? তিনি বললেন, সকালে এসেছি, মেয়েরা সঙ্গে আছেন, ওই যে ওঁরা ওখানে দাঁড়িয়ে, আজই সন্ধ্যায় মধুপুরে ফিরবো।

সত্যকারের সহৃদয় মানুষ এই উমাপ্রসাদ। মনে পড়ে লাণ্ডি-কোটালের সেই বাঙালী ছোকরার কাছে এঁর প্রশংসা শুনেছি। এও মনে আছে 'মহাপ্রস্থানের পথে' বদরীকাশ্রমের পাণ্ডা সূর্য্যপ্রসাদের নিকট শুনেছি এঁর সহৃদয়তার কথা। খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনা ক'রে মেয়েদের নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যায় একই গাড়ীতে আমরা সবাই মধুপুরে ফিরেছিলাম। এবার কাশী যাবার পালা। কাল বড়দিন। রাতের বেলা ঘোলাটে চাঁদের আলোয় মাঠের চেহারা বদ্‌লে গেছে। কানের কাছে মুখ রেখে রবিন গান ধরলেন। তাঁর যে সুরবোধ আছে দুনিয়ায় একথা শুধু আমারই জানা ছিল। গোপনে আমার কানের কাছে ছাড়া তিনি আর কোথাও গান্ না। হয়ত তার কারণও আছে। তাঁর বিশ্বাস সঙ্গীত শাস্ত্রটা আমার কিছুই জানা নেই। হঠাৎ গান থামিয়ে তিনি বললেন, ভাবতে পারো? আমাদের মেদিনীপুরেই তার বাড়ী। লোকটি মোক্তার, বিয়েও করেছে, প্রায় পঁয়তাল্লিশের ওপর বয়স হবে। ভাই বলবো কি, রোজ বিকেল বেলা বারো মাইল রাস্তা সাইকেল নিয়ে সে কাঁসাই নদী পার হয়!-- বললাম, যায় কোথায়? রবিন জানলার বাইরে তাকিয়ে বললেন, একটি মেয়ের কাছে বয়স তার কিছু বেশি, দরিদ্র কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ে। জল নেই, ঝড় নেই, শীত নেই, গরম নেই, যাওয়া তার চাই। যায় আর পরদিন বেলা দশটায় ফিরে কোর্টে আসে। কিন্তু বড় কোন্‌টা! স্ত্রী বেচারীর জীবনের ব্যর্থতা, না লোকটির প্রেম? লোকটিকে গালাগাল দিতে গিয়ে তার প্রশংসা না ক'রে পারিনে।

হয়ত বললে ভালো হ'ত, যেখানে মত্ততা সেখানে গভীরতা

নেই। যে-প্রেম তোমাকে অন্ধ করল, মনুষ্যত্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ কতটুকু? এক নারীকে দুঃখ দিয়ে, ব্যথা দিয়ে, আর এক নারীকে অন্ধের মতো ভালবাসার কোনো অর্থ-ই হয় না! কিন্তু থাক্, যেখানে মানুষের চরিত্রের বৈচিত্র্য নিয়ে কথা, সেখানে নীতির কোনো প্রশ্নই নেই!

গাড়ীতে সেদিন বড়দিনের কন্‌সেশনের ভিড়। অনেক রাত্রে কি-একটা ষ্টেশনে হঠাৎ ধাক্কাধাক্কি লেগে গেল। আমি ছিলাম দরজার কাছে ব'সে, সুতরাং শক্তির পরীক্ষা দিতে হোলো। মারামারি বাধলো। আমি তখন তরুণ, রক্তটা গরম,—কী যে করলাম সে আর মনে নেই। রেলওয়ে পুলিশ ছুটে এলো, গার্ড এলো, এলো ষ্টেশন মাষ্টার। সকলেই আমার বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত। গাড়ীর ভিতরে যারা আমাকে উৎসাহ দিয়েছিল, তারাই এবার বললে, এঃ, বুকের ছাতি ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিলে যে বড্ড, এবার ঠ্যালা সাম্‌লাও? গুণ্ডামি করবার আর জায়গা পাওনি!

গাড়ীতে চল্লিশ জন বসবার কথা, কিন্তু হিসাব ক'রে দেখা গেল, ষাটজনের উপর হ'য়ে গেছে! সেই যুক্তিতে এবং বহু বিতণ্ডার পর সেরাত্রে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেলাম। তারা আমাকে ধমক দিয়ে নেমে গেল। সাপ, বাঘ আর পুলিশ—এদের চিরদিনই ভয় করি। ভয়ে শীতের রাতেও ঘাম বেরিয়েছিল! ট্রেণ ছাড়ার পর ধড়ে প্রাণ এলো।

সুমুখের বেঞ্চে দুজন স্ত্রীলোক এই গণ্ডগোলের ভিতরে নিঃশব্দে ব'সেছিল। এইবার তারা ঘোমটা খুলতেই দেখা গেল, তারা পুরুষ! একজন উপর দিকে বাঙ্কের প্রতি লক্ষ্য ক'রে বললে, ওরে ভট্‌চায—বেঁচে আছিস?

উপর থেকে জবাব এলো,—না রে শালা, বাঁচলে বড় জ্বালা! মারধোর থেমেছে?

—থেমেছে, এবার নেমে আয়।

—মারকুট্টে ছোক্‌রা গেল কোথায়?

—এই যে তোর নীচেই বসেছে। মাইরি, মেয়েমানুষ সেজে বসে-ছিলুম, তাই এ যাত্রা প্রাণ বাঁচলো। ওরে ভট্‌চায, দাদাভাইকে একটা সিগ্রেট্ খাওয়া।

উপরের বাঙ্ক্ থেকে ভট্‌চায একটা সিগারেট বার ক'রে হাতখানা ঝুলিয়ে একেবারে আমার মুখে গুঁজে দিলেন। রবিন দেশলাই জ্বালালেন। ভট্‌চাযের চেহারাটা তখনো দেখিনি।

সিগারেট টান্‌ছি, এমন সময় ভট্‌চায নামলেন। চোখে চোখ মিলতেই তিনি সবিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, আরে, তুই?

—হরিমামা, আপনি?—ব'লে তাঁরই দেওয়া সিগারেটটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। তিনি আমার বরাহনগরের মামা,—গুরুজন হ'য়ে সিগারেট গুঁজে দিয়েছেন মুখে! দুজনের কী গভীর লজ্জা!

মামা বললেন, কোথায় চলেচিস রে?

—কাশী।

—আমিও ত কাশী যাবো। ওরে শালা চক্কোত্তি, দ্যাখ্ কা'র ভাগ্নে! বাঘের বাচ্চা, তা জানিস? অতগুলো লোককে মেরে পাট্ ক'রে দিলে। বেশ করেছিস বাবা, মামার নাম রেখেচিস।

চক্কোত্তি বললেন, দ্যাখ্ ভট্‌চায, তোর সব কথা ফাঁস ক'রে দেবো, ওর মামা ব'লে আর পরিচয় দিস্‌নে,—ওর নাম ডুববে। তুই ত

চিরকেলে কাপুরুষ,—সেবারের এঁড়েদার বারোয়ারিতলার কাণ্ডটা একবার ভাগ্নেকে শুনিয়ে দেবো ?

—থাম্ থাম্ ইয়ারকি করিসনে।—মামা বললেন।

চক্কোত্তি বললেন, তবে চুপ, ম্যালা কপ্‌চাবিনে !

পরদিন প্রভাতে কাশী এসে পৌছলাম।

কাশীর গঙ্গার তীরে আগে একটি অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য দেখা যেত। আজ সেখানে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা খরদৃষ্টি বিদ্যুতের আলো এবং দ্বারভাঙা ঘাটের কোণে মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধের প্রতি একটি বিশ্রী বিদ্রূপের খোঁচার মতো একটা বৈদ্যুতিক 'লিফ্‌ট' অহঙ্কারের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। সুবিধাবাদের কাছে হয়ত সৌন্দর্য্যবোধের কোনো মূল্য নেই। বিষয়বুদ্ধি দিয়ে যারা পৃথিবীকে মাপে, তারা কি জানে ম্লান জ্যোৎস্নায় অন্ধকার নদীতীরের রহস্যময় রূপ ? কিন্তু না, অভিমান যাদের কাছে জানাবো, মানুষের সৌন্দর্য্যপিপাসু হৃদয়ের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। বস্তু আর বিষয় নিয়েই যাদের সভ্যতা, আর্টের তারা কি জানে !

আগ্রায় এবার প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন। আগের দিন কাশী থেকে রওনা হলাম। গাড়ী বদল করলাম না, কিন্তু বন্ধু বদল করলাম। এবারের সঙ্গী শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী। সুরেশচন্দ্রের হৃদয় এবং তাঁর ব্যবহার, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টি ছোট কোন্‌টি বড় তা আজো বুঝতে পারিনি। না পারারই কথা। উপন্যাস পড়ি,

নায়কের ভিতরের সঙ্গে বাইরের মিল নেই। সুরেশ যখন অন্তরে গভীর বন্ধুবৎসল, বাইরে তিনি তখন উদার হ'তে পারেন না। বাইরে তিনি যখন উপকারী এবং মিষ্টভাষী, তখন তাঁর অন্তরের দিকে তাকালে মাথা চুল্‌কোতে হয়। তবু বলি, সুরেশ সেদিন রাত্রে ট্রেণে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করেছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

প্রাতঃকালে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আগ্রায় এসে নামলাম! সাত বছর পরে আবার আগ্রায়। হ্যাঁ, সাহিত্য সম্মিলনী বটে। প্রকাণ্ড সেণ্ট্ জন কলেজটি ঘিরে বাঙালীরা ভিড় করেছেন। ছেলে মেয়ে, এমন কি চাকর বাকর পর্য্যন্ত বাদ যায়নি। সভাপতিগোষ্ঠির আলাদা আলাদা ঘর। মেয়েদের দিকটাও পৃথক। তেরপল ঘিরে তাঁদের এবং তাঁদের প্রতি দৃষ্টিকে আট্‌কে রাখা হয়েছে। বাঙালী মেয়েরা বোধকরি রূপবতী নন্ নৈলে তাঁদের পর্দ্দায় ঘিরে রাখার এ দুর্ব্বলতা কেন! কিন্তু সে যাই হোক, সম্মিলনী এবার কা'কে নিয়ে? ঝানু ভ্রমণবীর বৃদ্ধ দাদা জলধর সেন নেই, সম্মিলনীর মঙ্গলঘট রসচিত্রকার বৃদ্ধ কেদার বাঁড়ুয্যে নেই—এঁরা না হ'লে বৈঠকের কর্ণ ধরবে কে? উঠোনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই আগ্রার পাণ্ডা যোগেন কাব্যতীর্থ একমুখ হেসে বললেন, এসেছ? কি ভাগ্যি, কথা যে রাখলে? অনেক কথা আছে।—ব'লে তিনি মুহূর্ত্তেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বোঝা গেল, কোনো কথাই নেই! আদর, আপ্যায়ন, আহার, আনন্দ এবং আয়োজন কোনটারই ত্রুটি নেই। এই সম্মিলনীতে আর সবাই উপস্থিত ছিলেন

কেবল খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা বাদ! চোখে দেখলাম কেবল কতকগুলি অবস্থাপন্ন, বিলাতি-নকল-করা, বেশী মাইনের চাকুরে বাঙালীর প্রদর্শনী। যাঁরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রবাস-বাসী, বৎসরান্তে তাঁরা একবার ক'রে আসেন পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করতে। এই সম্মেলনের গন্ধ অনেক দূরে ছড়ায়, নানাদেশের নানা মক্ষিকা তাই আসেন এখানে মধু সংগ্রহ করতে। আমাদের জন্য উনপঞ্চাশ নম্বরের ঘর দেওয়া হোলো। তা ত' হবেই। বারীনদা'র সঙ্গে তখন 'বিজলী' চালাই, উনপঞ্চাশীতে ছাড়া আর কোথায় স্থান পাবো!

প্রথম দিনে তাজমহল দর্শন। দিবাভাগের খররৌদ্রে শহরের কোলাহলের মাঝখানে যে তাজমহল, তার কোনো বিস্ময় নেই। সে-তাজ সম্রাটের হৃদয়াবেগ নয়, ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার। জনতার কৌতূহল-দৃষ্টি তাকে নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত ক'রে চলেছে। সে তাজমহল আত্ম-গোপন করতে জানে না, নিজের অনাবৃত পাথরের স্তূপকে লোকচক্ষে প্রকট ক'রে তোলে। তখন দেখা যায় যে-মজুর ভিত কেটে পাথর বসিয়েছে একটি একটি ক'রে, তার কপালের ঘাম, যে-রাজপ্রতিনিধি প্রজার রক্ত শোষণ ক'রে এনেছে স্বর্ণমুদ্রা তার মত্ততা, একে আকার দেবার জন্য যে-সেনাপতি জনপদকে বিধ্বস্ত ক'রে এনেছে লুণ্ঠিত বস্তু-সম্ভার, তার নিষ্ঠুরতা,—একে সম্পূর্ণ করবার জন্য বিশ বৎসর ধ'রে কত মানুষের লাঞ্ছনা, কত শাস্তি, কত অভিশাপ, কত উপবাসী বুভুক্ষিত কর্ম্মীর রক্তক্ষরণ। যে-প্রেম ঐশ্বর্য্যের মধ্যে গর্ব্বিত হয়ে উঠেছে তার আত্মপরিচয় কি? তার চেয়ে যে-মেয়েটি প্রিয়কে হারিয়ে পথের একান্তে ধূলোয় লুণ্ঠিত হয়ে আত্মদান করল, যে চোখের জলই ফেলে গেল কিন্তু আত্মপ্রকাশ করতে পারল না, যার প্রেমের কোনো বাস্তিক

পরিচয় নেই, রাজপুত্র যার তেপান্তর পার হয়ে আর এসে পৌঁছল না,—তার ভালোবাসা যে আরো দুঃখ সয়ে গেছে! তাজমহলের ফাটলে মিথ্যা অমরত্বের বিদ্রূপ।

দিবালোকের অহঙ্কার নিশীথের ভালোবাসার পায়ে আত্মাঞ্জলি দেয়। রাত্রির তাজমহলের একটি বিশেষ প্রকাশ আছে। রূপ যদি নিজেকে নগ্ন ক'রে উগ্র হয়ে প্রকাশ পায় তবে সে আপনাকে খরচ ক'রে ফেলে। নিশীথের তাজমহল অন্ধকারের আবরণে নিজের খানিকটা ঢেকে রাখে। সৌন্দর্য্য যখন ইন্দ্রিয়াতীত, তখন বলতে হবে বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ নেই। রাত্রির তাজমহল যখন পৃথিবীর বন্ধন খুলে শ্বেতপাখা মেলে চন্দ্রালোকের দিকে উঠতে থাকে, তখনই মনে হয় সম্রাটের প্রেমের একটি তপস্যা ছিল। নীচে বৃদ্ধা যমুনার শীর্ণ কঙ্কাল আজো সে প্রেমের তপস্যাকে স্মরণ ক'রে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। একাকী অন্ধকারে তাজমহলের ধারে এসে বসলে মনের মধ্যে যেমন একটি অকারণ প্রলাপ গুঞ্জন করতে থাকে, বাইরে তেমনি একটি অস্বস্তিকর নীরবতা আনে। কঠিনকে কোমল করে, তাজের দৃশ্য পৃথিবীতে তাই এত বড় আকর্ষণ!

সবাই ফিরলাম। ভোজনের পর বসলো সম্মেলনের বৈঠক। মূল সভাপতি অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষটি। স্পষ্ট সৌজন্য এবং ভদ্রতায় তাঁকে সহজেই বোঝা গেল। অকারণ বিনয়ের উচ্ছ্বাসে তিনি উত্যক্ত করেন না। মুখে ছাঁটা-গোঁফ, মাথায় ছোট ছোট কাঁচায় পাকায় চুল, চোখ দুটি উজ্জ্বল, পরিচ্ছদ নিতান্তই বাঙালীর মতন। সদালাপী এবং মিষ্টভাষী। শুনেছি তিনি একজন ঐতিহাসিক।

তিনি একটি অভিভাষণ লিখে এনেছিলেন সাহিত্যের উপর।

কিন্তু তাঁর অধিকারের অপব্যবহার দেখে সভাস্থ লোকেরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি সম্মেলনের সভাপতি এবং ঐতিহাসিক হয়ে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করতে লাগলেন।

এবার উঠলেন সাহিত্য শাখা। কোঁচানো ধুতি, সুকর্ত্তিত পাঞ্জাবী, গায়ে মূল্যবান শাল, পায়ে লপেটা জুতো, সুন্দর চেহারাখানি একেবারে ফিট্‌ফাট্।

একজোড়া পুরু কালো গোঁফের নীচে থেকে নারীনিন্দিত কণ্ঠে তিনি তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণটি পাঠ করতে শুরু করলেন।

পিছন দিকে হাঁটা আমাদের জাতীয় স্বভাব। বর্ত্তমান দিনের মানুষ হয়ে অতীতের দিকে তাকানোয় পৌরুষ নেই। ভবিষ্যতে যার ভরসা কম, অতীত হোলো তার মূলধন। কিন্তু সাহিত্যটা যে ক্রমে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আজকে ইনি সভাপতি হ'লেন, কাল হবেন মাধবদাস মোদক। যাই হোক অভিভাষণটির মধ্যে তাঁর কপালের ঘাম দেখা গেল।

তারপর উঠলেন দর্শন শাখার সভাপতি। স্বল্প সুন্দর সুললিত ভাষায় তিনি আধুনিক সাহিত্য ও জীবনের মর্ম্মকথাটি বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, কলঙ্কের চেয়ে চন্দ্রালোক অনেক বড়। জীবনের ক্রমবিকাশ চলেছে সাহিত্যে নবরূপে, নবরসে, নব প্রেরণায়। আধুনিক সাহিত্য ও জীবন হয়েছে মহাতীর্থসঙ্গম। ক্ষুদ্রকে সে তুচ্ছ করেনি, নগণ্যকে সে মহীয়ান্ ক'রে তুলেছে! দর্শকগণ তুমুল জয়ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

মেয়ে-বৈঠকের সভানেত্রী হয়েছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, এবং তাঁর সহকর্ম্মিণী ছিলেন শ্রীমতী অলকা সেন। তাঁদের বৈঠক হয়েছিল

অলক্ষ্যে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর চিন্তার বিশিষ্ট ধারা, রসবোধ, এবং সৌজন্য সকলকেই আনন্দিত করেছিল।

এবারের পালা ভাঙনের।

দু'শো পাখী মিলে তিন দিন ছিলাম একই গাছে, এবার সকাল হয়েছে, কে কোন্‌দিকে এখন উড়ে পালাবো তার ঠিক নেই। উৎসবের পর আজ বাজলো বিচ্ছেদের বাঁশী। আজ আর কেউ আত্মহারা নয়, আত্মসচেতন। যারা এসেছিল অতি কাছাকাছি, আজ মনে হোলো তারা অনেক দূরের, অনেক দুর্গমের। আমাদের জীবনের এই জটলায় কত মানুষের সঙ্গে পরিচয়, কত আত্মীয়তা, কত ঘনিষ্ঠতার কোলাকুলি; তারপর যখন হাট ভাঙে তখন দেখি আমরা প্রত্যেকে কত সুদূরে একাকী বিচ্ছিন্ন পান্থ, আমরা সবাই সঙ্গীহীন' আমাদের প্রত্যেককে অতিক্রম করতে হচ্ছে এক অজানা অনির্দ্দিষ্ট সীমাহীন পথ!

এবারের যাত্রা মীরাটের দিকে। এখানেও আর একদফা সঙ্গী বদল হোলো। সাহিত্যিক অবনীনাথ রায় ও শিকারী ক্ষিতীশ পাল। সৌজন্যের ডানা মেলে অবনীবাবু ঘিরে রইলেন। ক্ষিতীশবাবু শুরু করলেন শিকারের বিচিত্র কাহিনী। পাশে আছেন যদুনাথ সিংহ। মল্লিক মহাশয় ও ডাক্তারবাবু রসের পরিবেশনে পথকে মুখরিত করলেন। অধ্যাপক হরিমোহনবাবু ভাবছিলেন, রাত সাড়ে আটটার পর মীরাটে পৌছলে আর আহারাদি হবে না। প্রবাসী বাঙালীর ছোট ছোট

বিচিত্র সুখ দুঃখের আলাপ শুনতে শুনতে সমস্ত পথ অতিবাহিত হোলো।

মীরাটে গিয়ে অবনীবাবুর কাছেই আতিথ্য নেওয়া গেল। পরিচয় হোলো অধ্যাপক প্রিয়কুমার গোস্বামীর সঙ্গে। ভদ্র ও শিক্ষিত মানুষটি। ক্ষিতীশবাবুকে পেলাম ঘনিষ্ঠভাবে।

তিনদিন পরে ফিরলাম নয়াদিল্লীতে অবনীবাবুরই সঙ্গে। বন্ধুগণের বাসায় রবিবারের কি বিপুল আড্ডা। টেইলার স্কোয়ার সচকিত হয়ে উঠলো। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অনেকেই নিজের নিজের লেখা সাময়িক পত্রের কষ্টিপাথরে ঘষাঘষি করেন। সন্ধ্যার সময় এলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বাৎসরিক পিণ্ডদানকারী কাঁটালপাড়ার রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। তিনি 'উর্ম্মিলা-চরিত' অভিনয় করলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের চোখে পর্দ্দা ফেলা ছিল নৈলে দেখতে পেতেন তাঁর কষ্টকল্পিত ব্যর্থ নাটকখানির প্রতি শ্রোতাদের কী মনোভাব! যাই হোক্, সভাপতি অবনীবাবুকে ধন্যবাদ যে, তিনি হাস্য সম্বরণ করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু আর না। নূতন দিল্লীর কোনো আকর্ষণ নেই। একদা কুতব মিনারের মাথায় উঠে একবার দেখে নিলাম এই সুবিশাল ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসশালা—আধুনিকস্থ যুগের বিক্রমাদিত্য লর্ড আরউইনের লীলাভূমি।

তারপর একদিন অপরাহ্ণ বেলায় এই মহানগরীর কাছে একাকী বিদায় নিলাম।

বিচিত্র এই ভারতবর্ষ! প্রতি দশ মাইলে এর ভাষা বদ্‌লায়, প্রতি পঞ্চাশ মাইলে বদ্‌লায় এর জল-হাওয়ার গুণ! সমস্ত ভারত জুড়ে রয়েছে অত্যন্ত স্পষ্ট সাত রকম রংয়ের (original colour) মাটী, এ ছাড়া খুঁজলে আরো কয়েকটি রং মেলে! ভূগোলে যা আছে ভারতেও তাই আছে, নেই শুধু আগ্নেয়গিরি। অগ্নিগিরি থাকা এদেশের পক্ষে অস্বাভাবিকই হ'তো। ভারত কোনোদিনই অগ্নি উদ্গার ক'রে কিছু ছারখার করেনি! সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করা ও সারা পৃথিবী ভ্রমণ করার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই—অবশ্য লোক-চরিত্র এবং দেশের নাম ছাড়া।

আবার অনেকদিন পরে ভ্রমণে বেরিয়ে আম্‌বালা থেকে লাহোরের পথে যেতে এই কথাটিই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বনে-অরণ্যে, নদীতে-পর্ব্বতমালায় এ-পথ অপূর্ব্ব স্বপ্নজড়িত, তবু এ বনশ্রেণী এবং প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে আমাদের বাঙলার কোনো মিল নেই—এর আকাশের চেহারা পর্য্যন্ত আলাদা।

লাহোর পার হ'য়ে গেলে দুর্ব্বাজড়ানো মাটীর সঙ্গে মানুষের আর বিশেষ কোন যোগ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু চাষ-আবাদ যৎকিঞ্চিৎ। রুক্ষ পাহাড়, অনুর্ব্বর প্রান্তর, ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল,—আর কঙ্করময় অসমতল পথ। পঞ্চনদীর দেশে জলের অভাব অসাধারণ। গ্রীষ্মকালে হয় অগ্নিবৃষ্টি এবং শীতকালে তুষারপাত। শীত এবং গ্রীষ্ম ছাড়া এ দেশে আর কোনো ঋতু নেই—বর্ষার কোনো বিশেষ রূপ এখানে দেখা যায় না,

তা যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি যন্ত্রণাদায়ক, তেমনি শ্রীহীন। ভাদ্রের শেষে পরিষ্কার নীল আকাশে ও সাদা মেঘে দিন কয়েকের জন্য শরৎকাল উঁকি মেরে যায়। পাঞ্জাবে আমার অনেক দিন কেটেছে।

জুন মাসের প্রথম। গ্রীষ্মের অগ্নিজ্বালায় বিপর্য্যস্ত হয়ে একাকী একদিন অপরাহ্ণে রাওয়ালপিণ্ডি ছাউনি ষ্টেশনে নামলাম। বেলা সাড়ে ছ'টা হলেও সূর্য্যাস্তের একটু দেরী আছে। ধুতী, পাঞ্জাবী এবং চটিজুতা পরা বাঙালী দেখে সবাই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। এমন সহজ পরিচ্ছদে এতদূর পথ কোনো বাঙালী যে আসতে পারে এ তাদের ধারণায় নেই। ভারতের যে-কোনো প্রদেশের লোকেরা বাঙালীকে শ্রদ্ধা, ভয় এবং সন্দেহের চোখে দেখে। তারা মনে করে বাঙালীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং যে-কোনো বাঙালীই 'বিপ্লবী' দলের লোক। এই কারণে পাঞ্জাব, গুজরাট ও হায়দ্রাবাদে আমি প্রায় 'একঘরে' হয়ে ছিলাম।

আত্মীয়-বন্ধুহীন নিঃশেষ নির্ব্বাসন। অপরিচিত পথে নেমে চারিদিকে তাকাচ্ছি। কোন্ দিকে যাবো? পাঞ্জাবী, শিখ এবং মুসলমানের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝলাম, মুখ আমার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে! জোয়ান-জোয়ান পাঠান, তাদের যে-কেউ আমাকে একহাতে ক'রে টিপে মেরে ফেল্‌তে পারে। ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, দেরী করতে পারিনে। সঙ্গে যৎসামান্য মালপত্র ও একটি জীর্ণ শয্যা আয়োজন। দুনিয়ার যা আমার শেষ সম্বল তাই এনেছি সঙ্গে। তবু ওই জঞ্জালগুলি সঙ্গে না থাকলে পথ অনেকটা সহজ হ'তো।

যে-পথ জানা নেই, যে-পথের দিশা নেই, সে-পথ অতিরিক্ত উৎসাহহীন। বিদেশের পথে নেমে তাই প্রথমেই আসে ক্লান্তি এবং ভয়। ভয় বেশী ব'লেই বিদেশে আমরা অস্বাভাবিক সাহসের অভিনয় করি।

প্লাটফরমের বাইরে এসে হতচকিত হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি এমন সময় জনতিনেক টাঙা গাড়ীর গাড়োয়ান ছুটে এলো। তারা এসে যে মিশ্র ভাষায় কথা শুরু করল তার সঙ্গে আমার জিহ্বার বিন্দুমাত্র যোগা-যোগ ছিল না। যে-লোকটা বয়োবৃদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, তাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বললাম, শহরের জনারণ্যের মাঝখানে আমাকে নিয়ে যেতে হবে। কত ভাড়া চাও?

সে বললে, আট আনা।

আট আনা?—হো হো ক'রে একেবারে হেসেই উঠলাম। অর্থাৎ কতটুকু পথ তা যেন আমার বিশেষ ক'রেই জানা আছে। হাসি থামিয়ে বললাম, পাঁচ আনায় যাবি?

যে যদি বল্‌ত দু'টাকা তাহলেও আমি অম্‌নি ক'রে হাসতাম এবং বলতাম, সিকে পাঁচেকে হবে?—মানুষের স্বভাব এমনি। যাই হোক, লোকটা ছ'আনায় রাজি হতেই ভয়ে ভয়ে তার টাঙায় উঠলাম। বৃদ্ধ অপরিচিত গাড়োয়ানটা যে আমাকে বিপথে নিয়ে গিয়ে যথাসর্ব্বস্ব ছিনিয়ে নেবে না তা বেশ পরীক্ষা করে বুঝে নিয়েছি।

পথ অনেক দুর। সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে। রেলের পুলের তলা দিয়ে চলেছি পূর্ব্ব মুখে। পথ জনবিরল হ'লেই গা ছম্‌ ছম্‌ ক'রে উঠ্‌ছে! শহরের সঙ্গে ছাউনির দূরত্ব এক ক্রোশের বেশী নয়। দু'ধার দেখতে দেখতে চলেছি, যদি কোথাও বাঙালীর দেখা পাই! শহর নিতান্ত ছোট নয়, জনবাহুল্য যথেষ্ট। চারিদিকে দোকান বাজার, গাড়ীঘোড়া, কাফিখানা, চায়ের দোকান, গাড়ীর আড্ডা,—এবং স্বাধীন নরনারীর দল। মেয়ে পুরুষের স্বাস্থ্যশ্রী প্রথমেই চোখে পড়ে।

গাড়ী নিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক হায়রানি এবং অনেক খোঁজা-

খুঁজির পর এক ডাক্তারখানা মিললো। সাইন্ বোর্ডে বাঙালীর নাম লেখা! বাঁচলাম! মনে হোলো যেন কোনো নিকটাত্মীয়ের সন্ধান পেয়েছি! কাছে গিয়ে দরজায় গাড়ী থামিয়ে নেমে ভিতরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি একটিও বাঙালী নেই! ঠিক এই দোকানই ত? বাইরে গিয়ে আর একবার 'সাইন্ বোর্ড' প'ড়ে, আবার এসে ভিতরে দাঁড়ালাম। গুটি তিনেক পাঞ্জাবী ও গুটি দুই শিখ ভদ্রলোক বসেছিলেন। একজন আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে বললেন, what do you want please?

কাছে গিয়ে বললাম, ডাক্তার বাবু আছেন!

বাঙলা ভাষা ব্যবহার করেছিলাম তার এই অকারণ ইংরাজি প্রীতির প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে। কিন্তু ফল হোলো অন্য রকম। ওধারের চেয়ার থেকে একটি মোটাসোটা পাঞ্জাবী উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ অকল্পিত বঙ্গভাষায় বললেন, বাবা অসুখে আছেন, আপনার কি দোরকার আছে বোলবেন হামাকে?

অবাক হয়ে তাঁকে বললাম, আপনাকে বাঙালী বলে ত' চেনবার উপায় নেই! আমি আসছি বেনারস থেকে, মারী যাবো। দয়া ক'রে আমার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন্।

ছেলেটি বসবার জায়গা দিল। জিনিষপত্র নামিয়ে গাড়ীভাড়া চুকিয়ে দিলাম। ছেলেটি কাছে এসে হাত জুড়ে ইংরাজী ভাষায় বললে, আপনি উর্দ্দু জানেন না, তবে দয়া ক'রে ইংরাজীতে কথা বলুন, বাংলা আমরা বল্‌তে পারি না। আপনি মারী যাবেন বলেছেন। সন্ধ্যার পর ত' কোনো মোটর পাহাড়ে উঠবে না, আজ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে!

অপেক্ষা ত করবো, কিন্তু কোথায়? এদিকে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা যে অনাহারে চলছে! মিনিট দুই বেয়াকুবের মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। অতিথিকে যে স্বজাতি সাদরে প্রথমেই বরণ ক'রে নিল না, তার কাছে ভিক্ষা করি কেমন ক'রে?

অনেক কাঠখড় পার হয়ে ডাক্তারবাবুর দেখা পাওয়া গেল। পাশেই একটা সরু গলির মধ্যে একখানা দোতলা বাড়ীতে তিনি সপরিবারে থাকেন। কাছে গিয়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়িয়ে নিজের আর্জ্জি পেশ করলাম। দাঁত এবং জিবের রোগে ভুগছেন, তবুও সেই অবস্থায় উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমি সে রকম লোক নই বুঝলেন, বাড়ী আমার খোলা, যার খুশী সেই এসে থাকতে পারে! এই মাস চারেক আগেকার কথা মশাই, দুটি বাঙালীর ছেলে কাশ্মীর যাবার পথে শ্রীনগরে পৌঁছলে, শুনলাম রাজনৈতিক হত্যার ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়েছে! শেষকালে আমার এখানেও থানা-পুলিশ! আপনার এদিকে কি জন্যে আসা?

পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বা'র ক'রে তাঁর সুমুখে ধরলাম। তিনি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, তা বেশ, army service পেয়েছেন,-- এমন চাকরীতে বাঙালীরা বিশেষ আসে না বটে! আচ্ছা, আপনি যান্ নীচে, আমার ছেলে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

ডাক্তারখানার উপরের তলায় একটি ছোট্ট পরিত্যক্ত কুঠরীতে এক রাত্রির বাসা স্থির হোলো। হোক ক্ষুদ্র, হোক বাসের অযোগ্য তবু একটি নিভৃত নিবাস পেয়ে আনন্দের আবেগে একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার পথশ্রম দূর হয়ে গেল। শুনেছি, নিবিড় মিলনের মধ্যে প্রেমিকের অন্তরে বিরহের ব্যথা বাজতে থাকে। শ্রীরাধা নাকি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠালিঙ্গন

ক'রে কেঁদে ফেলেছিলেন, আগামী প্রাতে দয়িতকে ছেড়ে দেবার বেদনায়। ঘরখানিকে পেয়ে আমারো একটি নিঃশ্বাস পড়লো—এই সুখনীড় কাল সকালেই ছেড়ে যেতে হবে!

বাড়ীর দরজার কাছে রাস্তার একটি পাইপের তলায় ব'সে স্নান করলাম। ভীষণ গরমের মধ্যে পাহাড়ী ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে ব'সে আরামে চোখ বুজে এল। যে-কোনো মধুর স্মৃতির পাশে সেই স্নানের স্মৃতি অনায়াসে স্থান পেতে পারে। শরীর সুস্থ হোলো। তারপর আহারের আয়োজন। হ্যাঁ, ডাক্তারের রসবোধ আছে বটে! আহারের উপকরণগুলি দেখলে একাদশীর বিধবা পর্য্যন্ত ব্রত ভঙ্গ করবেন! আহারাদির পর চাকর এসে বিছানা ক'রে দিয়ে গেল। ভগবান, তুমি আছ!

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস সে-রাতে আমায় পরিত্যাগ করল না। ঘরে এবং ঘরের একটা জানালার ঠিক নীচেই রাশি রাশি ঔষধের ভাণ্ডার। রাতে যখন দোকান বন্ধ হয়ে গেল, তখন ধীরে ধীরে সহস্র রকমের গন্ধ ঘরের মধ্যে জমতে লাগল। এবং সে-গন্ধের ক্রিয়া যে কি ভয়ানক তা শুধু আমিই জানি। বাইরের হাওয়া আসবার পথ কোথাও নেই। একটি মাত্র জান্‌লা, ওদিকের দরজাটাও বন্ধ! ঘুম হোলো না, সেই ভয়ানক, বিশ্রী কটুগন্ধের মধ্যে জেগে ব'সে রইলাম। বেরোবার পথ নেই, যাবই-বা কোথায়? গন্ধের ক্রিয়ায় একটু একটু ক'রে মাথার মধ্যে মাতাল হয়ে উঠ্‌লো। গা বমি বমি করছে! অনেক দুর্ভাগ্যই দেখেছি—কিন্তু আজকে নালিশ জানাবো কা'র কাছে? সমস্ত রাত্রি সেদিন যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হয়ে ঘরময় পায়চারি

ক'রে কাট্‌লো। এর চেয়ে আমার পথে পথে আশ্রয়হীন হয়ে বেড়ানো ভালো ছিল।

পরদিন যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নমস্কারান্তে বিদায় নিয়ে মোটর লরীতে গিয়ে উঠলাম। বেলা তখন সাড়ে ন'টা। মোটর গাড়ী চল্লিশ মাইল পাহাড়ের মাথায় উঠে মারীতে পৌঁছে দেবে; ভাড়া দু'টাকা। কয়েকজন কাশ্মীরের যাত্রীও পাওয়া গেল। কোহালা থেকে ঝিলম্‌ নদী পার হয়ে তারা যাবে শ্রীনগর।

মোটর ছাড়লো। মাঝখানে মাইল সাতেক সমতল প্রান্তরের পথ। রোদের তাতে পথ অম্‌নি ধূ ধূ করছে। মাঝে মাঝে দু'ধারের অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে সামান্য কিছু কিছু ফসল উৎপাদনের চেষ্টা আছে, কিন্তু সে নিষ্ফল চেষ্টা। মোটর চলেছে হু হু শব্দে। দূরে সমস্ত উত্তর দিকটা জুড়ে হিমালয় যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের শুরু— চোখে দেখা যায় না, আন্দাজ ক'রে নিতে হয়।

মোটর ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপর উঠ্‌ছে। মানুষের সমাগম, লোকালয় আর নজরে পড়ছে না। পর্ব্বতের কটি বেষ্টন ক'রে শীর্ণ ধূসর পথরেখা এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে আবার পাহাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ক্রমশ উপরদিকে উঠে চলেছি। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এসেচে,—গ্রীষ্মের পর এল বসন্তকাল, কচিৎ কোথাও কোথাও পাখীর কূজন শোনা যাচ্ছে। নীল আকাশের গায়ে দেওদার ও পাইন-বনের ছায়া পড়েছে। নীচের দিকে ক্রমশঃ গভীর হয়ে আসছিল, হেঁট হয়ে

তাকালে এবার মাথা ঘুরে যায়। পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, মোটরের সামান্য অসাবধানতা হলেই আমরা অতলে গভীরতার মধ্যে প'ড়ে মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবো। কিন্তু স্নিগ্ধ শান্ত অরণ্যের পথে যেতে যেতে সমস্ত মন মধুর তৃপ্তিতে ভ'রে উঠেছে।

মাইল পনেরো আন্দাজ পথ এসে এক সৈন্যের ব্যারাকের কাছে মোটর থাম্‌ল। পথের পাশে একটি ছোট মুসলমানী হোটেল। মাংস, ডিম, রুটি ইত্যাদি পাওয়া যায়। ওদিকে কয়েকজন সৈন্য-বিভাগের কর্ম্মচারীর কাঠের বাংলো। আমাদের তৃষ্ণার্ত্ত মোটর গাড়ী খানিকটা জল পান ক'রে নিল।

মোটর ছাড়তেই দেখি হোটেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে একটি মেয়ে এসে পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো। হঠাৎ এখানে কোথাও স্ত্রীলোক দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, অবাক হয়ে গেলাম। মেয়েটি মুসলমানী, রূপবতী, পরণে চুড়িদার পায়-জামা, গায়ে চুড়িদার পাঞ্জাবী ও ওড়না, পায়ে চটিজুতা। পান খেয়ে মুখের ভিতরটা কালো হয়ে গেছে, হাতের নখগুলি তার মেহেদিপাতার রসে রঙিন। গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতেই সবাই হেসে হৈ চৈ ক'রে উঠলো! স্পষ্ট বোঝা গেল সবাই তাকে চেনে। এইখানেই সে কোথায় থাকে, বয়স তার কাঁচা। মোটর থামিয়ে একটা পুরুষোচিত ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে ডান্ পা আগে গাড়ীর উপর বাড়িয়ে চড়্‌লো। একজন তাকে হাত ধরে' টেনে নিল। সবাই যেন তাকে সামান্য একটু খুশী করতে পারলে বাঁচে। ওর তোষামোদ করা যেন তাদের গৌরব।

—এই হট্‌কে বৈঠো, সিধা হো কর্!

ফিরে তাকাতেই মেয়েটি বললে,—কাঁহাসে আতা হায়!

হাতের খোঁচা খেয়ে চম্‌কে উঠলাম।

থতিয়ে গিয়ে বিনীত ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বললাম,—বেনারস সে।

—উয়া কোন্ মুলুক? হিন্দুস্থান্‌মে?

বললাম,—জি হাঁ।

—ইদ্‌র্ কাঁহা যায় গা?

—কো-মারী।

—শায়ের করনা?

—নেহি, নোকৃরি হ্যায়।

—নকৃরি? তুম্ নোকর্ হ্যায়?—মেয়েটি সকলের দিকে তাকিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হাসল। আমাকে লোকচক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ ক'রে দেওয়াই যেন সে হাসির চরম সার্থকতা। সমস্ত ভঙ্গী দিয়ে আমাকে অপমান ক'রে সে অস্বাভাবিক গৌরব অর্জ্জন করবে! হাসতে হাসতে সে একটা সিগারেট ধরালো। মোটর ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে।

খাড়াই পাহাড়ের উপর মোটর উঠছে হামাগুড়ি দিয়ে! সমস্ত শক্তি খরচ ক'রেও তার বেগ নেই, কিন্তু তার হুঙ্কার কী ভয়ানক! হিংস্র বন্য একটা জন্তু বহুকষ্টলব্ধ শিকার হারিয়ে যেন পাগল হয়ে চীৎকার করছে।

একদিকে দেওদার ও পাইনের বিশাল বিস্তীর্ণ অরণ্য,—ছায়া-নিভৃত, গহন-গভীর। ধরিত্রী দেবী মাথা তুলে শত লক্ষ বাহু বিস্তার ক'রে যেন আকাশকে আলিঙ্গন করতে চাইছেন। অরণ্যের গভীরতার মধ্যে যখন বায়ুর তরঙ্গ বইতে থাকে, তখন সেই গুরু-ধ্বনির মধ্যে সুদূর মহাসাগরের কল্লোলের একটি আভাস পাওয়া যায়! যে-মানুষ তপস্যা করবে তার সমুদ্রের ধারে গেলে চলবে না,—সেখানে শুধু উত্তেজনা,

বিক্ষোভ, সম্ভোগের চেহারা,—অশান্ত জীবনের ইঙ্গিত; তপস্বীর পক্ষে অরণ্যই প্রশস্ত, কেন না সে উদাসীন, ধ্যানগভীর,—অরণ্যের মধ্যে একটি উদার প্রশান্তির দেখা পাই!

বাঁদিকে নীচে আর নজর চলে না, সমস্তই ক্ষুদ্র হয়ে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কোথাও কোথাও যৎসামান্য পাহাড়ী কুল্‌ফা শাকের চাষ, তারই পাশ দিয়ে চলেছে এক একটি সর্পাকৃতি পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী। পথের নীচে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়িয়াদের এক একটী কুটীর। লাল কাঁকর মিশানো মাটী ও পাথর দিয়ে তারা চমৎকার 'ডেরা' তৈরী করতে পারে। পাহাড়ীরা হিংস্র নয় কিন্তু বন্য। শহরে যেতে তারা ভয় পায়। শীতের দেশে তারা সুস্থ থাকে, বরফ পড়লে বরফ কেটে পথ তৈরী করে, মজুরীর বদলে গম আনে, কম্বলের পোষাক পরে, 'চপলি' পায়ে দেয়,—এমনি তাদের জীবন। মেয়েরা বলিষ্ঠ, সুন্দরী এবং নোংরা। পাহাড়ীরা কোথাও হিন্দু, কোথাও বা মুসলমান।

মোটর চলেছে। পাশে ব'সে মুসলমানী মেয়েটি সিগারেট টান্‌ছে। একটু আগে আমার মুখে অপমানের ও লজ্জার কালী মাখিয়ে সে যেন তৃপ্তি পেয়েছিল। পরিচিত লোক দুটির কাছে অনর্গল সে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ ক'রে হাসাহাসি করছে। পুরুষকে তাচ্ছিল্য করা ও অবজ্ঞা করাই যেন তার সেই লীলা ও লাস্যের সার্থকতা। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারকে এমন ক'রে প্রকাশ করতে আমি আর কোনো মেয়েকে দেখিনি।

একটা সরাইখানার কাছে এসে আবার মোটর থাম্‌ল। অসাবধানে আমার হাঁটুর উপর একটা ধাক্কা মেরে মেয়েটি হুড়মুড়িয়ে গাড়ী

থেকে নেমে গেল। সে চড় মেরে গেলেও হয়ত আমি চুপ ক'রে বসে থাকতাম! পথে নেমে সরাইখানায় ঢুকে বিনা অনুমতিতে সে একটা পাত্র থেকে এক মুঠো বাদাম তুলে নিয়ে চিবোতে শুরু করল। দোকানের মালিক হেসে বললে, অওর লেও ইয়ার!

এই খাতিরটুকু খুব সহজে উপভোগ ক'রে মেয়েটি একবার তাকালো আমার দিকে, আমি তখন নির্ব্বাক হয়ে নির্লিপ্ত-ভাবে তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

একজন অন্ধ ভিখারী ইতিমধ্যে গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাতে শুরু ক'রেছিল। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না সেই সুদূর পাহাড়ের ছায়াশীতল নিভৃত সরাইখানার ধারে অন্ধের বাঁশী কেমন ক'রে বেজেছিল। আমি অন্ধের দিকে নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে চেয়ে রইলাম। এমন করুণ সুন্দর একটানা সুর আমি জীবনে শুনিনি!

আমার মধ্যে যে-গ্লানি জমে উঠেছিল তা অপসারিত হয়ে গেল। বাঁশী যখন থামল, তখন আবার মেয়েটির দিকে তাকালাম। একটি লোক তখন ডান হাতে তার কটি বেষ্টন ক'রে রয়েছে। মেয়েটি কিন্তু আর হাসছে না, হাসি তার ইতিমধ্যে কখন ফুরিয়ে গেছে। হয়ত সে ভেবেছিল যে স্বাধীনতাকে সে ব্যক্ত ক'রে চলেছে, আমি তাকে বাহবা দিয়ে যাবো! নারী যখন নিজের সুষমা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে পদদলিত করল, তখন তার স্বাধীনতা হোলো শ্রীহীন। পুরুষোচিত রূঢ় বিক্রম প্রকাশ ক'রে যে নারী দুর্দ্দম বেগে পথে নেমে এল, সে কর্ম্মিষ্ঠা হ'তে পারে, কিন্তু তার সেই ক্ষণ-উত্তেজনাকে নারীধর্ম্ম বলব না। কোনো মতে পুরুষ হয়ে উঠ্‌তে পারাটাই মেয়েদের মুক্তির চরম কথা নয়!

সবাই উঠলে গাড়ী আবার ছাড়লো! পথ আর বাকী নেই। মেয়েটি এবার সম্মুখের বেঞ্চে স'রে বসেছে! তার মুখে কথা আছে কিন্তু হাত-পায়ের অস্থিরতা তার থেমে এসেছে। আর একটি সিগারেট ধরাবার জন্য সে বে'র করেছিল কিন্তু সেটি হাতের মধ্যে রেখে সে নাড়াচাড়া করছে, ধরাতে সে যেন ভুলে গেছে।

পাশের লোকটা শিষ্ট তোষামোদের হাসি হেসে তাকে কি যেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করল কিন্তু মেয়েটি তার মুখের দিকেই একবার তাকালো, জবাব দিল না। আমি তাকিয়েই ছিলাম তার দিকে, চোখে আমার ঔদাসীন্য হয়ত ছিল কিন্তু ঘৃণা বা তিরস্কার কিছুই ছিল না। যে-মেয়ে অস্থির তাকে শাসন করতে ধমকের প্রয়োজন নেই, নিঃশব্দে নির্লিপ্ত হ'য়ে চেয়ে থাকাই নির্লজ্জ নারীর পক্ষে কঠিন শাস্তি।

কতক্ষণ এমনি ক'রে কেটে গেছে। চমক যখন ভাঙলো, দেখি 'সানি ব্যাঙ্ক' এসে পড়েছে। এইখান থেকেই প্রকাণ্ড সৈনিকের ব্যারাক এবং 'স্টোর আপিস' শুরু হয়েছে। আমাদের মোটর বাস এসে তারই ধারে থাম্‌ল। ফল, গম, শাক-সব্জির গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। 'সানি ব্যাঙ্ক' ছোট একটি শহর। দোকান বাজার আছে, একটি যাত্রী-নিবাসও দেখা গেল। এখানে দুটি মাত্র পথ, একটি গেছে কাশ্মীরের দিকে, আর একটি পূর্ব্ব দিকে মারীর দিকে উঠেছে। এতদূর এসে জানলাম, কো—মানে, পাহাড়।

কয়েকজন যাত্রী নাম্‌ল, খানিকক্ষণ সোরগোল ক'রে আমাদের বাস চললো মারীর দিকে। বহু জনপদ, মনুষ্যচিহ্নহীন বহু দুর্গম পথ নিতান্তই একাকী অতিক্রম করেছি, তবু এখানে এসে বুকের

ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। চাকরি নিয়ে এসেছি, এখানে স্থায়ী বসতি বাঁধতে হবে—এই চিন্তাটাই অত্যন্ত করুণ। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, সামান্য উদরান্ন সংস্থান করবার শক্তি আমার নেই—সবাই তাই আমাকে জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অনাদৃত অপমানিত প্রত্যাখাত আমি এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই এ দেশের চেহারা দেখে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলাম। এইখানে আমাকে দিন কাটাতে হবে? কেন? কী অপরাধে? অত বড় বাংলা দেশে কি এক হাত জমি আমার জন্য ছিল না?

ছোট এক পথের কিনারায় জিনিষপত্র সমেত আমাকে নামিয়ে দিল। বেলা তখন চারটে বাজে। পথে বার দুই গাড়ী খারাপ হয়েছিল, তাই তিন ঘণ্টার পথ ছয় ঘণ্টায় আসতে হোলো। আপিসের ঠিকানা ছাড়া আর কোনো ঠিকানা আমার নেই। কেউ একবার জিজ্ঞাসাও করল না আমি কোথায় যাবো! কাব্যে গল্পে আমরা যতই 'পথের প্রেম, পথের মায়া' ব'লে গলা ফাটাই না কেন, ভবঘুরে ব'লে যতই নিজেদের সম্বন্ধে গৌরব করি,—আসলে সত্যি সত্যি যখন পরিত্যক্ত হয়ে পথে এসে পড়ি আশ্রয় এবং সঙ্গীহীন হয়ে, তখন তাতে না-থাকে আনন্দ, না-থাকে রোমান্স্। এই পর্ব্বত-চূড়ায় নির্ব্বাসিত হয়ে এই কথাটাই প্রথম আমার মনে হোলো।

একটা পাহাড়ীর মাথায় জিনিষপত্র দিয়ে ঘোরাঘুরি করছি। যেদিকে তাকাই পাহাড়ের পর পাহাড়, আর সেই পাহাড়গুলির গায়ে ছোট ছোট দেশলায়ের বাক্সের মতো এক একটি বাড়ী লেগে রয়েছে। পাঞ্জাবী, শিখ্, পেশাওয়ারী, পাহাড়ী, কাশ্মিরী—এদের সংখ্যাই বেশী! বাদ্‌বাকি সমস্তই গোরাপল্টন। এরাই উত্তর ভারতের

প্রধান রক্ষী—আফগান এবং সীমান্তের আক্রীদীর হাত থেকে এরা দেশ রক্ষা করে। এদের কেন্দ্রের নাম তাই Northern Command Headquarters। ভারতের চার কোণে চারটি Command.

অনেক খোঁজাখুঁজি, অনেক নাকালের পর আপিসের দরজা মিল্‌লো। গোরাপল্টনের সংস্পর্শে আসিনি কোনোদিন—পা দুটো ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। আশেপাশে কোনো কোনো অফিসার ঘোড়ায় চ'ড়ে ছুটে চলেছে, কেউ যুদ্ধের বেশে সজ্জিত হয়ে মার্চ্চ কর্‌তে কর্‌তে চলেছে, কেউ চলেছে যেন আশু বিপদের সম্ভাবনায়। সবাই তটস্থ, সবাই অস্থির, বেগবান, সময়ানুবর্ত্তী, কর্ম্মচঞ্চল। কোথাও জড়তা নেই, অলস মনোবিলাস নেই, হৃদয়ের ধার কেউ ধারে না, কারো সঙ্গে কারো আত্মীয়তা নেই, বন্ধুত্ব নেই, অন্তর বিনিময় নেই,—যেন এক প্রকাণ্ড মরুভূমির মাঝখানে এসে পড়লাম।

নিরুপায়ের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে দরজার ভিতর ঢুকে উঁকি মার্‌লাম। জন পাঁচেক দেশী লোক ব'সে কাজ কচ্ছিল। একজন মুখ ফিরিয়ে তাকালো। ইংরেজীতে আর একজন বললে, কি চান?

বললাম, এটা 'এম্-টি সেক্‌সন্'?

লোকটি এবার হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে এল, তারপর আমার হাত-খানা টেনে নিয়ে মর্দ্দন ক'রে বললে, Yes, we are awaiting for you. Are you Mr. Sanyal, coming from Benares?

একে একে সবাই করমর্দ্দন কর্‌লেন। তারপর যথারীতি পরিচয়, আপ্যায়ন এবং কর্ণেলের সঙ্গে বাক্যালাপ হয়ে গেল। লোকগুলি ভালো। গায়ে পাঞ্জাবী, এবং পায়ে চটিজুতো ও পরণে ধুতি দেখে

সবাই কিছুক্ষণ সস্নেহে হাসাহাসি করল। দেশী পোশাকের সঙ্গে তাদের পরিচয়ই নেই! তাদের মতে এমন বাতুল কে আছে, যে সৈন্য বিভাগের চাকরীতে ধুতি চাদর ও চটিজুতো ব্যবহার করবে? সাহেবরা যে হেসেই খুন হবে। শ্বেতাঙ্গ লোকদিগকে খুশী করবার অতিরিক্ত আতিশয্য বাংলা দেশ ছাড়া এখনো সকল প্রদেশেই বর্ত্তমান। তারা শাসক ও শোষকের জাতি ব'লে বাইরে থেকে যতই কটুক্তি করি কিন্তু কাছাকাছি এসে আমরা যে-কোনো উচ্চ-স্তরের দেশী লোককে তাচ্ছিল্য ক'রে একজন তৃতীয় শ্রেণীর ফিরিঙ্গির সঙ্গে যেচে কথা ব'লে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় inferiority complex (দাস মনোভাব)!

তবু বুঝলাম এই নির্ব্বাসনের শাস্তি মাথায় নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। এই পর্ব্বত চূড়ায় ব'সে ব'সে দেখবো, মাথার উপর দিয়ে একটি একটি ঋতু পার হয়ে চ'লে যাবে, একটি একটি দাসত্বের দিন খ'সে যাবে জীবন থেকে, পরমায়ু থেকে! অর্থ উপার্জ্জন ছাড়া জীবনের আর কোনো কাব্য, আর কোনো স্বপ্ন, আর কোন আদর্শ থাকবে না। সমাজের কাছে বিদায় নিয়েছি, বন্ধু পরিজনকে এবার ধীরে ধীরে ভুলে যেতে হবে! আপাতত কিছুদিন ধ'রে ঘন ঘন চিঠি পত্র যাতায়াত করবে, তারপর আর কেউ খবরই নিতে চাইবে না! দণ্ড হিসাবে প্রাণদণ্ডই বড় নয়, কারণ তার পরিসমাপ্তি অতি সহজেই হয়—নির্ব্বাসন হচ্ছে কঠিনতম শাস্তি! কারাগারের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে যাদের স্থান হয়েছে তারাই জানে সঙ্গীহীন হওয়ার শাস্তি কী ভয়ানক! যে-শাস্তির দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না, যার কথা কেউ জানাবেও না, সহানুভূতির আশা যাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে, নির্জ্জন নির্ব্বাসন

তার কাছে প্রতি মুহূর্ত্তেই দুঃসহ বেদনার বোঝা! এই পাহাড়ের চূড়ায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমাকে প্রেতের মতো অবিরাম টহল দিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে—আমার বন্ধু থাকবে না, স্বভাষী থাকবে না, অবলম্বন থাকবে না—শুধু প্রতি-মাসের পয়লা তারিখে মাইনে পাবো, এবং আবার সেই বিশেষ দিনটির আশায় তিরিশটি দিন মুখ বুজে পরিশ্রম ক'রে যাবো,—একি! এমনি ক'রে আমার কর্ম্মজীবন যাবে, যৌবন যাবে, আমার স্নেহমমতা শুকিয়ে যাবে, হৃদয়ের সকল আবেগ ম'রে যাবে, মনুষ্যত্বের ক্রম-বিকাশ নষ্ট হয়ে যাবে? একদিন হয়ত দেখবো, আমার পরিশ্রমের আর শক্তি নেই, আমার কোমরের জোর ক'মে গেছে, আমার মাথার চুল পেকেছে, দাঁত পড়তে শুরু হয়েছে,—সেদিন আমাকে পেন্‌সন্ দিয়ে এরা বলবে, যাও, তোমার মেয়াদ ফুরিয়েছে। কোথায় যাবো সেদিন? বহু যুগের সাধনালব্ধ অমূল্য জীবনকে নিঃশেষে শোষণ ক'রে নিয়ে আখের ছিব্‌ড়ের মতো পথের ধারে সবাই ফেলে দেবে—সেদিন নিজের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবো? সেদিন একথা বল্‌লে কে শুনবে যে, শুধুমাত্র দাসত্বের সুখ উপভোগ করবার জন্য বিধাতার কাছে জীবন ভিক্ষা ক'রে আনিনি, এসেছিলাম অন্য কাজে, অন্য সাধনায়—যে-সাধনার আমি অবসর পেলাম না, আমার সময় ছিল না!

শুনলাম একটি বাঙালী এখানে আছেন। আপিসেরই একটি লোকের সঙ্গে আবার বাসা খুঁজতে বেরোলাম। 'ম্যাল' থেকে প্রায় দু'শো ফিট নীচে মারী-বাজার। ভদ্রলোক আমায় পথ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চললেন। 'সিমেট্রি ওয়ে' নামক গড়ানে পথটি ধ'রে নীচে নেমে এলাম। বেলা তখন অপরাহ্ণ।

কিছুদূর এসে সবিস্ময়ে দেখলাম, পথের উপরেই একটি কাঠের বাংলোর বারান্দায় এক বৃদ্ধ বাঙালী হাতে 'কোঁস্তা' নিয়ে ঝাঁট দিচ্ছেন। পরণে হাঁটু পর্য্যন্ত একটি ময়লা ধুতি, গায়ে খাকি সার্ট, পায়ে খড়ম, চোখে চশমা! মূর্ত্তিমান বাংলার প্রতিনিধি! আমার পাঞ্জাবী সঙ্গীটি আঙুল দিয়ে তাঁকে দেখিয়ে চ'লে গেলেন।

আঃ বাঁচলাম! হেসে কাছে গিয়ে বললাম, দাদা, নমস্কার।

তিনি মুখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক তাকালেন। বললাম, চাকুরি নিয়ে এসেছি 'নদার্ণ কমাণ্ডে'—কিন্তু থাকবো কোথায়? একটুখানি আশ্রয় দেবেন না?

নিশীথ রাত্রির মুখের উপর যেমন ধীরে ধীরে সকালের স্বচ্ছ স্নিগ্ধ আলো ফুটে ওঠে, তেমনি ক'রে বৃদ্ধের মুখখানি ক্রমবিকশিত হাসিতে ভ'রে গিয়ে টলমল ক'রে উঠল্।

কাছে এসে আমার হাত ধরে বললেন, এসো ভাই, এসো!

ভাবলাম, চুলোয় যাক্ আমার স্বদেশ, এই আমার স্বর্গ।

* * * *

মারী পাহাড়ে অনেক দিন কাটল। নির্ব্বাসনের আর কোনে ক্ষোভ নেই, বৃষ্টির জলে ধুয়ে আকাশ যেমন প্রশান্ত হয়ে ওঠে, তেমনি একটি বিষণ্ণ স্নিগ্ধতার দেখা পেয়েছি। ধ্যানাসনে স্তিমিতলোচনে মহাদেব আকাশের দিকে মাথা উঁচু ক'রে বসে আছেন, তাঁরই জটার মধ্যে আমার ছোট্ট বাসা।

মাথার সীঁথির মতো একটি মাত্র পথ, সে পথের আর বৈচিত্র্য নেই। পথটির এক প্রান্তের নাম 'রাওয়ালপিণ্ডি পয়েণ্ট', অন্য প্রান্তটির নাম 'কাশ্মীর পয়েণ্ট'। পিণ্ডি পয়েণ্টের মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দূরা-

স্তরের সমতল ভূমির আভাস নজরে পড়ে, আকাশ ঝুলে পড়েছে মাটীর নীচে, সন্ধ্যার প্রথম সন্ধ্যা-তারাটিকে দেখা যাবে ভূমি চুম্বন করছে! আমি চিরদিন মনে রাখবো সেই করুণ সন্ধ্যাতারাটিকে। তার সঙ্গে ছিল আমার বন্ধুত্ব, অনেকদিনের অনেক মনের কথা তাকে জানানো আছে। প্রতি সন্ধ্যায় সে তার ভীরু প্রদীপটি জ্বেলে এসে দাঁড়াত দূরে। তার কাছে শেষে বিদায় নিতে গিয়ে চোখে আমার জল এসেছিল! আজও মাঝে মাঝে কোনো কোনো সন্ধ্যায় সমস্ত আকাশ ঘুরে ঘুরে সেই সন্ধ্যাতারাটিকে খুঁজে বেড়াই, কিন্তু পাইনে। কেমন করে পাবো? সত্যিকারের যে পাওয়া, সে হচ্ছে মমত্ববোধের মধ্যে, বন্ধুত্বের মধ্যে—নৈলে আকাশে আজও রয়েছে সেই তারা, কিন্তু সে নেই, সে শুধু একা আমারই ছিল, প্রতিদিনই যার সঙ্গে হ'তো আমার প্রথম পরিচয়, প্রথম শুভদৃষ্টি! আজ, বহুজনতার আকাশে আমার সেই ভালোবাসার করুণ তারাটি হারিয়ে গেছে।

উত্তর দিকে প্রান্তে কাশ্মীর পয়েন্ট। কিছুই দেখা যায় না, শুধু গগনচুম্বী পর্ব্বতমালা,—তুষারাচ্ছন্ন, শুভ্র, হিম-আলয়। নাগ পর্ব্বত, নন্দা দেবীর চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়, উচ্চতায় ছাব্বিশ হাজার ফুট। কিন্তু কেমন ক'রে বোঝাব তার রূপ কেমন! পর্ব্বতের পদতলে এবং সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে, আমি জানি, পা কাঁপে, বুক কাঁপে, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে কিন্তু কথা বলা যায় না! তাদের বিরাট মহিমার কাছে মানুষের ক্ষুদ্র ভাষা, নগণ্য আশা, সকল কীর্ত্তি হয়ে যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ। কাশ্মীর পয়েন্টের দিকে অরণ্যের ছায়ায় চারিদিক প্রায়ই অন্ধকার থাকে, লোকসমাগম এদিকে একটু অল্পই, অথচ প্রাকৃতিক শোভায় এদিকটি অপূর্ব্ব রমণীয়। নিভৃতে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে কবির দৃষ্টি নিয়ে দেখবার অনেক

চেষ্টাই অনেকদিন করেছি, কিন্তু যা দেখেছি তা ছাড়া আর কোনো দিনই কিছু দেখতে পাইনি। পাইন্ বনের নিভৃত ছায়ান্ধকার স্থান আমার আজ মনে পড়ে, একটি ঝাউ গাছের ছোট্ট ডাল ঝুঁকে পড়েছিল একটি গোলাপ গাছের মাথার উপর, সেটিকে স্পষ্ট মনে করতে পারি—আর ভুলতে পারিনি একটি শুক্‌নো ঝর্ণার পদচিহ্নকে। অস্তমান সূর্য্যের রাঙা রশ্মি গাছের জটলার ভিতর দিয়ে সেই শুষ্ক ঝর্ণার পথটিকে দিনান্তে একবার স্পর্শ ক'রে যেতো। এইটুকু দেখবার জন্য আমি প্রায়ই দু'মাইল পথ ছুটে যেতাম।

প্রথম দু'মাস আপিসের কয়েকঘণ্টা ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলিনি। ভাষা জানিনে, জানিনে সামাজিকতা। মৌনব্রত নিয়েছিলাম। পাছে কেউ আলাপ করতে আসে, কেউ পাছে কথা বলে এজন্য লুকিয়ে পাহাড়ের কোন গোপন স্থানে ডুব দিতাম। বেশ বুঝতাম, আমার মধ্যে একটি মানুষ কেবলই যেন নিবিড় তপস্যার আসনে বসতে চাইত। যে-কোন মানুষকেই সে এড়িয়ে বহুদূরে পালাবার চেষ্টা করে। আমার মধ্যে আসর জমাবার মজলিশী মানুষ কোনদিনই নেই, সে চিরদিন আত্মগোপনকামী, পলাতক, বিষয় উদাসীন। পালিয়ে বেড়িয়ে যাদের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করেছিলাম, তারা হচ্ছে কয়েকটি গাছ ও কয়েক টুকরো পাথর। কত পাথরের গায়ে কত পাথরের টুক্‌রো দিয়ে যে কত কথা লিখে এসেছি আজ তার কিছুই মনে নেই। এই সময় কবিতা লেখার একটি একান্ত প্রেরণা অনুভব করতাম। কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব! আমি দ্রষ্টা কিন্তু স্রষ্টা নই, শ্রোতা কিন্তু বক্তা নই—আমি ভাবতে পারি কিন্তু ভাবাতে পারিনে, লিখতে পারি নে। জানতে পারি, জানাতে

পারিনে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে কত বড় তখনই বুঝতে পারি, যখন বুঝি আমাদের আত্মপ্রকাশের অক্ষমতা কতখানি!

কাশ্মীর পয়েণ্টে একটি দিনের কথা মনে পড়েছে। একটি ইংরাজ মহিলা একাকিনী প্রায়ই আসতেন। মহিলাটির বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। রূপের বিচারে তিনি ওদেশের লোকের কাছে কোন্ পর্য্যায় পড়েন তা জানিনে। কিন্তু আমাদের বিচারে তিনি সুন্দরী। আসবার সময় তিনি এক হাতে কব্জা দেওয়া একটি ছোট্ট হাল্কা টুল ও একটি টেব্ল্ ও আর এক হাতে একটি ব্যাগ সঙ্গে ক'রে আনতেন। উত্তর দিকে মুখ ক'রে একখানি পাথরের উপর টুল ও টেবিলের কব্জাগুলি খুলে তিনি ব্যাগের ভিতর থেকে রং, তুলি ও কাগজ বার ক'রে ছবি আঁক্‌তে বসতেন। দূর থেকে তাঁকে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করতাম। ছবি আঁকার হাত তাঁর কেমন তা জানিনে, কিন্তু সাধনা দেখে মনে হ'তো মেয়েটি শিল্পী। আঁকতে আঁকতে দূর পর্ব্বতের দিকে তিনি মুখ তুলে নিমেষ-নিহত দৃষ্টিতে এক একবার তাকাতেন, আবার মাথা হেঁট ক'রে তুলি টান্‌তেন। বিকাল থেকে অন্ধকার না হওয়া পর্য্যন্ত এই ছিল তাঁর কাজ। অন্ধকার হ'লে আবার তিনি সমস্তগুলি একে একে গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেন, তারপর সেগুলি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে শহরের দিকে চল্‌তে শুরু করতেন। শ্রান্ত তনুলতাটি তাঁর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জঙ্গলের বাঁকে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেত, আমি নীরবে চেয়ে থাকতাম। আবার তার পরদিন দূর থেকে দেখি তিনি এঁকে বেঁকে তাড়াতাড়ি আসছেন, দেরি হ'য়ে গেলে ইস্কুলের মেয়েরা যেমন ক'রে আসে!

আমাকেও তিনি প্রতিদিন দেখে চ'লে যান। হঠাৎ একদিন তিনি

ডাকলেন। নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বেশ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, I see you come here everyday.

উত্তরটা গলার মধ্যে হঠাৎ আটকে গেল। শুধু একটু শিষ্ট হাসি হাসবার চেষ্টা ক'রে ঘাড় নাড়লাম। তিনি একবার ডানদিকে ফিরে তাকালেন, তারপর তাঁর ছবিটি আমার কাছে বাড়িয়ে ধ'রে বললেন, How do you like my painting ?

ছবিটী হাতে নিয়ে একটীবার মাত্র চোখ বুলিয়ে দেখলাম, দূরের পাহাড়টা ও দেওদার জঙ্গলের একটা পাশ চিত্রিত করা হয়েছে। তারপর ছবিটী তাঁর হাতে ফেরৎ দিয়ে শুধু বললাম, So good !

মহিলাটী একটু হাসলেন, হেসে বললেন, Don't you understand, It's a total failure. I am a student, practising only for a few days.

জিনিষপত্র সেদিনকার মতো গুছিয়ে নিয়ে তিনি বিদায়ের হাসি হেসে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। যাবার সময় ছবিখানি কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলেন। তাঁর তিরস্কারটুকু যখনই ভেবেছি তখনই ভালো লেগেছে। নারীর অযথা তোষামোদ করার গোড়ায় আমাদের একটী দৈন্য লুকিয়ে থাকে। যতবার তিনি পর্ব্বতমালার বিশাল রূপকে রূপ দিতে গিয়েছেন ততবারই তিনি পারেননি—শিল্পী মনের এই ব্যর্থতাটুকু সেদিন উপলব্ধি করতে পারিনি। সে তিরস্কার আমার পাওনা ছিল।

পথে কিম্বা দোকানের ধারে তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকবার চোখ-চোখি হয়েছে, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই,—চোখ বুলিয়ে দু'জনেই চলে গেছি।

ক্লান্ত মনে বাসায় ফিরি। একটী পাহাড়ী ছেলে কাজকর্ম্ম করে, রাঁধে, বাসন ধোয়। নাম—বিশুন্। বিশুন্ মাথায় টেরি কাটে,

চুরি ক'রে সাবান মাখে, মাঝে মাঝে গান গায়,—কয়েকদিন আগে একজোড়া চক্‌চকে চপ্‌লি এনে পায়ে প'রতে সুরু করেছে। কোনো কোনোদিন সে উধাও হয়ে যায়, আবার হাসতে হাসতে ফিরে আসে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পূবদিকে দূরে একটা রুক্ষ পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বলে, ওইখানে তার বাড়ী। বাপ আছে, ভাই আছে, একটী বোন আছে, মা আছে! প্রতি মাসে মাত্র একবার ক'রে বিশুন্ তার পায়-জামা ও কোর্ত্তা ধোলাই ক'রে আন্‌ত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে তাদের নাকি অস্বস্তি বোধ হয়।

বাসার ধারেই যে সরু পথটি পূব দিক হয়ে দক্ষিণে বেঁকে নীচের দিকে চলে' গেছে, তার নাম 'সিমেট্রিওয়ে'। পথটা জানা ছিল না। মাঝে একবার বারো দিনের জন্য জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একেই ত' দুটি সরকারী কৃত্রিম জলাধার ছাড়া এই সুউচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় জলের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। স্নান করা দূরে থাক্, পানের জলেরো অভাব! প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সিমেট্রির ধারে গিয়ে একটি বাঁধানো ঝরণার জল গেলাসে ক'রে খাবার জন্য ধ'রে আনতাম! অর্দ্ধেকটা খেয়ে বাকি অর্দ্ধেকটা রাতের জন্য মজুত থাকৃত। যাই হোক, সেই সূত্রে গোরস্থানের পথটা চেনা হয়ে গেল।

কিছুদিন ওই পথেই যাতায়াত চল্‌লো। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য পথ। গড়িয়ে গড়িয়ে প্রায় সহস্র ফিট নীচে নেমে গেছে। উৎরাইয়ে যাবার সময় তবু চলে, কিন্তু ফেরবার সময় চড়াইয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে জিব বার হ'য়ে আসে। গোরস্থানের কোলে ঝর্ণাটী ছাড়া ছোট্ট একটী ফুলের বাগান,

একটী আফিস ঘর ও ফটকের ধারে একজন পাহাড়ী রক্ষী। দিবানিশি জনহীন, নিস্তব্ধ; প্রহরীর মতো বুকচাপা প্রেতপুরী শবদেহ গ্রাস করার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা এখানে অত্যন্ত অল্প। রক্ষীর কাছে হুকুম নিয়ে মাঝে মাঝে ভিতরে ঢুকতাম। সবারই প্রস্তর-সমাধি। এবং সেই সমাধির উপর খোদাই করা করুণ স্মৃতির ভাষার মধ্যে কতজনের কত প্রিয়জন মাথা কুট্‌ছে। কিন্তু তার চেয়েও আমি আকৃষ্ট হতাম একটী মানুষকে এই নির্জ্জন গোরস্থানের ভিতর দেখে। লোকটী পাঞ্জাবী, সুপুরুষ বলা চলে, তার ময়লা পরিচ্ছদগুলি আপাদ-মস্তক ছেঁড়া ও সেলাই করা। মাথায় টুপি নেই, মাঝখানে বড় একটা টাক্। চোখ দুটী কেমন যেন অসহায় ভাষাহীন। পায়ে একজোড়া ছেঁড়া ক্যাম্বিশের জুতা। প্রত্যেকটি সমাধির পাথর সে একান্ত মনো-যোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে ক্রমাগত টহল্ দিয়ে বেড়াতো। এই ছিল তার নিত্যকর্ম্ম। সে যে কেন আসে, কী দেখে, কী খোঁজে, কী ভাবে —আজ অবধি তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আবিষ্কার করতে পারিনি। সে কি মৃত ও জীবিতের মাঝামাঝি কোনো গভীর তত্ত্বের খোঁজ রাখে?

তারপর এলো বর্ষাকাল। মারী পাহাড়ের বর্ষা কী ভয়ঙ্কর। ঝড় দেখেছি, মেঘ দেখেছি, শিলাবৃষ্টি দেখেছি—কিন্তু এমন দেখিনি! দৈত্য ও দানবের মতো সবগুলোকে একত্রে এমন দাপাদাপি ক'রে প্রলয়কাণ্ড বাধাতে কে কবে দেখেছে! সারা হিন্দুস্থানের চারিদিকে যেমন আকাশের সর্ব্বপ্রান্ত ঘিরে আষাঢ়ের মায়া ঘনায়, তার সেই ঘন কজ্জল রূপের মধ্যে কোথায় যেন একটি কোমল কাব্যপ্রাণ থাকে—কিন্তু এখানকার বর্ষার যেন প্রচণ্ড নিষ্ঠুর পরুষ রূপ, এর মধ্যে প্রলয়ের ক্রূর

কটাক্ষ, সর্ব্বনাশা ধ্বংসের চেহারা! এখানে ঝড়ের চিহ্ন যখন আকাশের কোণে জেগে ওঠে তখন জীবজন্তু পর্য্যন্ত ভয়ত্রাসে পলায়ন করে। ঝড় শুরু হ'লেই বড় বড় গাছ কোমর ভেঙে শুয়ে পড়ে, পাহাড়ের মাথা থেকে হাজার দু'হাজার টন্ ওজনের পাথর ধ্ব'সে উপর থেকে গড়িয়ে আসে এবং তার সেই ভয়ানক গর্জ্জন শুনে মানুষের শুধু হতচেতন হ'তেই বাকী থাকে। তারপর বৃষ্টি। কিন্তু সে-বৃষ্টি কাব্য-সাহিত্যের 'ঝর ঝর জলধারা' নয়, সে নিতান্তই বর্ব্বরোচিত। বৃষ্টির প্রথম দিকটা শুধু মাত্র শিলাপাত। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের কলহে যেমন রাস্তাঘাটে ইঁট ছোড়াছুড়ি শুরু হয়, ঠিক তেমনি। এই শিলাবৃষ্টিতে কত লোকের ঘরের ছাদ ফুটো হয়, কত বাড়ীর দরজা জান্‌লা ভাঙে, কত নিরীহ অসাবধান পথিকের মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। শিলাপাতের অল্পক্ষণ পরেই হয় ত আবার আকাশ ফর্সা হয়ে গিয়ে রোদ ওঠে। সেই আলোয় দেখা যায় পাহাড়ের চারিদিকে সেই শিলাগুলি লক্ষ লক্ষ হীরাখণ্ডের মতো সূর্য্যের আলোয় ঝল্‌মল্ করছে। বাঙালীর চোখের সঙ্গে সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের কোনো পরিচয় নেই।

প্রতি রবিবার ও মাসের শেষ শনিবারটি ছুটির দিন। ছুটির দিনে সময় আর কাট্‌তে চায় না, সুতরাং সেদিন নিজেই রান্নাবাড়া করতাম। সপ্তাহে এই দিনটিতে হতো আহারের বিলাস। অর্থাৎ সেদিন ভাত রান্না হতো। চালের মণ এখানে ত্রিশ টাকা। গমের 'চাপাটি' খেয়ে খেয়ে হাড় কালী হ'য়ে গিয়েছিল। আহারাদির পর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ধড়াচুড়া চড়িয়ে বেড়িয়ে পড়তাম। 'ম্যাল'-এর উপর ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যেত। আমার প্রিয় ঘোড়াটির নাম রেখেছিলাম

বুল্‌বুল্। ঘণ্টায় ছ’আনা ভাড়া। অতি ভয়ে ভয়ে বুলবুলের পিঠের উপর চড়তাম। ভারি শান্ত ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ে’ যখন ‘পিণ্ডি পয়েণ্ট’এর দিকে যেতাম, সহিসটা তখন পিছনে পিছনে ছুট্‌তো। পাহাড়ীরা দশ বারো মাইল অনায়াসে ছুটে যেতে পারে। ‘পিণ্ডি পয়েণ্ট্’ থেকে নীচে নেমে অনেক দূর গেলে ‘লরেন্স কলেজ’ পাওয়া যেত। সাহেবদের ছেলে মেয়ের ইস্কুল ও কলেজ। একটি বাঙালীর ছেলে সেখানকার ইলেক্‌ট্রীক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার। নাম চাটার্জ্জি। কলেজটাকে রেখে ডান্ দিকে অনেকদূর গেলে ‘বাঁশ্‌রা গলির’ পথ। পাহাড়ের চারিদিকে কতকগুলি পথের নাম ছাংলা গলি, ঘোড়া গলি, ছিকা গলি, পিনাকুল, ষ্ট্রবেরী, কন্‌ভেণ্ট ইত্যাদি। বাঁশ্‌রা গলির পথে বহুদূর গিয়ে পেতাম ‘মারী ব্রুয়েরী’। এইখান দিয়ে যাবার সময় সহিসটা বুল্‌বুলের ল্যাজ ধরে চড়াই-উৎরাই করত। ঘোড়ার ল্যাজ ধ’রে পাহাড়ে ওঠানামা করলে নাকি বিশেষ পরিশ্রম হয় না। ব্রুয়েরীর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামতাম। এখানে যন্ত্রযোগে পাইপের সাহায্যে ‘বিয়ার’ ও নানারকম পানীয় তৈরী হয়। উৎকৃষ্ট বিয়ারের জন্য মারী ব্রুয়েরী বিখ্যাত। অনেক জায়গার অনেক খরিদ্দারই এই অরণ্যবহুল পর্ব্বতের সানুদেশে জুটতো সস্তায় শরীর ও মনকে তাজা করবার জন্য। এখানে নিভৃতে মদ্যপানেরো সুবিধা ছিল। যারা এই কোম্পানীতে চাকরী করে তাদের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখতাম। অনেকদিন যাতায়াতের পর মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হ’য়ে জানতে পারি সে পাঞ্জাবী খৃষ্টান। মাতুলের সঙ্গে সে এই ব্রুয়েরীতে এসে বাস করছে। কথায় কথায় সে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, মাতুলের সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয়াসক্তির কাহিনী

আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জানাজানি হওয়ায় তারা দুজনেই এখানে চাকরী নিয়ে চলে এসেছে। মেয়েটি রূপবতী। চোখ দুটি তার শান্ত সৌজন্যে ভরা। মেয়েটি হাসতে হাসতে এক সময় জানালো, গির্জ্জায় চিরজীবনের মত তাদের প্রবেশ নিষেধ হ'য়ে গেছে।

আর একটি কথা মনে পড়ছে। একজন বন্ধু আমাকে একটি সেতার বাজাতে দিয়েছিলেন। সেতারের বর্ণ পরিচয় আমার এখনো শেষ হয়নি। তবু সেটি হাতে নিয়ে নিয়মিত যখন গোরস্থানের পথে পাহাড়ের ধারে কোনো নিভৃত স্থানে বাজাতে বসতাম, মনে হতো আমিই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতারী। ভাবতাম পাহাড় যে এত নিস্তব্ধ ও রুদ্ধনিশ্বাস সে শুধু আমার বাজনা শোনবার জন্যই। গাছ, পাথর, আকাশ, মাটী এদের সুর শোনাতাম। সঙ্গীতের আত্মার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। হয়ত বেসুর, হয়ত বেতাল, হয়ত অক্ষমতা, কিন্তু তার মাধুর্য্য ছিল। আমি আমার সুরের ভিতর দিয়ে স্বর্গের দেবতার দেখা পেতাম। মনে হ'তো যক্ষ, কিন্নর, রম্ভা, মেনকা আকাশের অঙ্গনে উৎকর্ণ হ'য়ে আমার বাজনা শুনছে। মানুষের পায়ের শব্দে আমার বাজনা থেমে যেত। মানুষের ছায়া আমার সহ্য হতো না। চূড়ায় ব'সে সেতার হাতে নিয়ে একদিন দেখলাম অনেক নীচে ছোট ছোট পাহাড়ের মাথায় বর্ষার মেঘ জমছে। মুহূর্ত্তের জন্য শুধু মনে হোলো আমি কত বড়! মাথায় আমার পর্ব্বত কিরীট, তার উপরে নীলকান্ত আকাশের জ্যোতির্ম্ময় চালচিত্র, বুকের কাছে দূর বিস্তার অরণ্যের লহরী, পদতলে আমার দোলায়মান মেঘমালা! সেই মেঘ জমতে লাগল ধীরে ধীরে। একটু একটু ক'রে নীচে চারিদিকে আচ্ছন্ন করল। তারপর এক বিরাট সমুদ্রের মতো শরীর

নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল উপর দিকে। নির্ব্বাক আতঙ্কে চুপ ক'রে বসে রইলাম। মেঘলোকের মধ্যে একটু একটু ক'রে ডুবে যাচ্ছি। সে কী অন্ধকার! সূর্য্য নেই, আলো নেই, আকাশ নেই, পর্ব্বত-অরণ্য নেই, নিজের হাত-পা পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছিনে, চোখ দুটো বন্ধ হ'য়ে গেছে! সমুদ্র কি দাঁড়িয়ে উঠলো? যেন অতল অকূল আলোর মধ্যে ডুবে গেছি! এ কোথায়? এ যে পা বাড়াবার পথ নেই! নাকে, মুখে, জামাকাপড়ে মেঘ ঢুকে বিন্দু বিন্দু জলে সব ভিজে গেছে। বেশ বুঝলাম, এর উপর ঝড় সুরু হ'লেই মৃত্যু! কেউ জানবে না, শুনবে না—টুপ ক'রে পৃথিবী থেকে খ'সে যাবো! তবে চোখ বুজে একবার শেষবার করযোড়ে মুখ তুলে দাঁড়াই—মৃত্যু, এসো তুমি নির্ভয়ে, আমার জীবন তোমাকে প্রীতি উপহার দেবো!

চোখ যখন খুললাম, দেখি পথ স্বচ্ছ হয়ে গেছে, বৃষ্টি সুরু হয়েছে। গুরু গুরু মেঘের ডাক! সেতারটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে দিলাম। বেঁচে যখন গেছি তখন বাঁচতেই হবে।

উঁচু নীচু পথ। হাঁপিয়ে উঠলাম। তবুও তীরবেগে এসে বাসার বারান্দার কাছে পৌঁছলাম। আজ আর নিয়মিত তিনঘণ্টা বেড়ানো হোলো না, নিতান্ত অসময়েই ফিরে এলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে বিশুন্ রোজ দরজায় তালা দিয়ে বেরোয়, আবার ঠিক সূর্য্যাস্ত হ'লেই ফিরে আসে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এখানে সাড়ে আটটার সময় সন্ধ্যা হয়। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি, তালা নেই, ভিতর থেকে বন্ধ। এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলাঠেলি করতেই একটু পরে ভিতর থেকে খুলে গেল।

জীবনে অনেকবার বিস্মিত হয়েছি, আজও হলাম। দরজা খুলতেই বর্ষার সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের ভিতর থেকে বিশুনের পাশ কাটিয়ে ষোল সতের বছরের একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বারান্দা পার হয়ে চলে গেল।

নির্ব্বাক শুধু কয়েকটি মুহূর্ত্ত। বিশুনলালের দিকে ফিরে দেখি দরজার কাছে মাথা হেঁট ক'রে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। এক-এক পা ক'রে এগিয়ে গেলাম। তারপর তার পিঠ চাপ্ড়ে উর্দ্দু ভাষায় বললাম, ভয় নেই, চাকুরি যাবে না, আগে একটু চা ক'রে নিয়ে আয় ত' দেখি!

আমি ক্লান্ত নই, কিন্তু কাজও নেই। দিন চল্‌ছে, মাস চল্‌ছে, বর্ষা-শীত চল্‌ছে সঙ্গে সঙ্গে,—পাহাড়ে পাহাড়ে, পাইন আর দেওদারের বনে বনে বিরহী যক্ষের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। কি করি বলো ত'? প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিজেকে নিরন্তর এই প্রশ্ন ক'রে চলেছি—কি করা যায় বলতে পারো? বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত, আমার কোনো কাজ নেই—এ কি ভয়ানক শাস্তি!

কী করি! সব পুরোণো হ'য়ে গেছে আমার কাছে। এমনি ক'রে থাকাটার মধ্যে আর কোনো নবত্ব নেই। প্রকৃতির রূপ যে এত বৈচিত্র্যহীন তা আমার আগে জানা ছিল না। প্রকৃতির প্রতিদিন একই কাজ, একই ছবি, একই চেহারা। বারে বারে তার পুনরাবৃত্তির অলজ্জ আড়ম্বর। বিশ্ববিধাতা আর্টিষ্ট্ হতে পারেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভার নব নব রূপ, নব নব অভিব্যক্তি নেই।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের আকাশ নিঙ্‌ড়ে নিঙ্‌ড়ে যা পাবার তা পেয়ে গেছি, আর কিছুই নেই। চন্দ্রালোক তেমনি একঘেয়ে, বিস্বাদ ও আধ-মরা। পাহাড় আর অরণ্য যেন বিশ্রী বাধা। রাত্রিবেলা এই পাহাড়ী শহরটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'তো, এক রূপ-বিলাসিনী নারীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে কতকগুলি আত্ম-অচেতন মানুষ ছুটে এসে তার সর্ব্বাঙ্গে মৌমাছির মতো পড়ে রয়েছে, আর তাদের উত্থানশক্তি নেই।

প্রকৃতি যেন প্রতিদিন নিজের কাজগুলি সেরে চ'লে যাবার সময় রক্তচক্ষে শাসন ক'রে যায়। দিনের শেষে সন্ধ্যা নেমে এলে রাগে আমি অন্ধ হ'য়ে উঠতাম, রাত্রি সকালের দিকে গড়িয়ে গেলে বেদনায়

আমার সর্ব্বশরীর টন্ টন্ করতো। ভাবতাম, চীৎকার ক'রে উঠে বাধা দিয়ে বলি, দিন রাত্রি এত সুশৃঙ্খলায় আমি হ'তে দেবো না, আমি এদের বাধা দেবো। এদের কারাগারের মধ্যে এমন ক'রে আমার পরমায়ু ক্ষয় হবে দিন-দিন, এ কিছুতেই সইবে না!

কী করি! অথচ আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে মনে হ'তো আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। সমস্ত শরীরের মধ্যে আমি একজন বলিষ্ঠ মানুষকে অনুভব করতাম। আমি চাকুরি করি, আমি চাকর, আমি দাস। উদরান্ন সংগ্রহ ক'রে চলা, বড়বাবুকে খুশি করা, হাত কচ্‌লানো, 'জল-উঁচু' ব'লে যাওয়া! কী কুৎসিৎ জীবন! প্রতিদিন দেয়ালের গায়ে ঘুষি মারতাম। আঙুলের হাড়ে লাগত, যন্ত্রণায় হাতটা রাঙা হয়ে উঠতো কিন্তু সেইটুকুই ছিল আমার তৃপ্তি। দাঁতের মধ্যে পিন্ ফুটিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত বা'র করতাম। দেশলাই জ্বেলে মাঝে মাঝে নিজের মাথার চুল পুড়িয়ে দিতাম। আমার মানবত্ব ছিল হয় এক স্তর নীচে, নয় ত এক স্তর উপরে। নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ে জান্‌বো আমি বেঁচে আছি, আমার প্রাণ আছে।

ইচ্ছে হ'তো বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করি। লুঙ্গি প'রে মস্‌জিদে গিয়ে ঢুকি, চীনা সেজে আফিং খেয়ে বুঁদ্ হয়ে বসে থাকি, কাবুলি সেজে সুদ আদায় করি। একোঽহম্ বহুস্যাম। আমি এক, আমি বহু। মনে মনে সেক্সপিয়র হয়ে ওফেলিয়াকে অনাদর করতাম, বিবেকানন্দ হয়ে নাস্তিক পাশ্চাত্যকে হিন্দুত্বে অনুপ্রাণিত করতাম, রবীন্দ্রনাথ হয়ে আমি বলতাম, 'যা পেয়েছি যা করেছি দান, মর্ত্তে তার কোথা পরিমাণ!' আমার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর আত্মা নিরন্তর অনুরণিত হয়ে বলত, সম্ভবামি যুগে যুগে! অন্ধকার ঘরে একান্ত যখন নিষ্ক্রিয়

হয়ে বসে থাকতাম, আমার আশেপাশে প্রকাণ্ড আসর জমতো। সভানেত্রী হতেন জোয়ান্ অফ আর্ক্। রাণী দুর্গাবতী, লক্ষ্মী বাই, মৈত্রেয়ী, সুভদ্রা —এঁরা পার্শ্বচারিণী। রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে উদ্বোধন হোলো! কর্ণ এসে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। দরজার একপাশে লর্ড আরুইন্, অন্য পাশে জগাই মাধাই। লর্ড রেডিং নাদির শার সঙ্গে করমর্দ্দন করছেন। শেলী ক্রোধান্ধ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহাত্মা গান্ধীকে একটি উচ্চাসনে বসিয়ে দিলেন। বার্ণার্ড শ হনুমানের মুখোস প'রে ঘরে এসে ঢুকলেন,—কতকগুলি আধুনিক লেখক হাততালি দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। বেদব্যাস শুধু দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। নেপোলিয়ন্ ও-ঘরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন!

সত্যি কি পাগল হয়ে গেছি? উঠে দাঁড়িয়ে সমস্ত শরীরটাকে নাড়া দিয়ে দেখলাম, কই না! হেঁট হ'য়ে 'চারপাই'-র একটা পায়ার উপর দাঁত বসিয়ে দেখলাম কই কামড়াতে ত ইচ্ছে করে না। যে পাগল সে নিজের গায়ের মাংস নিজে চিবোয়, আমি হাতের উপর মুখ দিয়ে দেখলাম, চিবোতে ইচ্ছা হোলো না ত?

কিন্তু সন্দেহ আমার গেল না! আমি মরতে পারি, পাগল হ'তে পারিনে! একটা লাঠি হাতে নিয়ে পথে বেরোলাম। যদি কেউ পাগল বলে, লাঠি মেরে জানাবো আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ মানুষ! পথে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি চললাম, কচিৎ কোনো কোনো পথিকের চোখে নিজেকে যাচিয়ে গেলাম, হাতের লাঠিটা নিস্‌পিস্ কচ্ছিল। বাজারের পথে নেমে এলাম,—আরও নীচে একটা গহ্বরের মতো সঙ্কীর্ণ পথ বেরিয়ে বরাবর সরকারী কাঠের গোলার দিকে চ'লে গেছে। সে-পথটি

মনুষ্যলেশহীন, সন্ধ্যার পর সেদিকে যাবার কারো কোনো হেতু নেই। আশ্চর্য্য, একটি কথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। এই ত সন্ধ্যা হয়েছে কিন্তু দিনের সঙ্গে রাত্রির এ কী তফাৎ! এমনটা বিশ্বপ্রকৃতির পক্ষে সম্ভব হোলো কেমন ক'রে? দিনের বেলা সূর্য্য ওঠে—প্রখর, নিষ্ঠুর, ধূলাধূসরিত। দিবালোকে কারো প্রতি কারো মমতা নেই,—পাপ ও ঈর্ষার ভয়াবহ নগ্ন রূপ, যন্ত্রণাদায়ক ঘর্ম্মাক্ত-সংগ্রাম।—দুঃখের, দাহের, অনন্ত পীড়নের! কিন্তু রাত্রে তার সে চেহারা নয়! রাতে দেখা দেয় জ্যোৎস্না, স্তিমিত, মন্থর, উদাসীন। জ্যোৎস্নার দিকে তাকালেই আমার কান্না আসে। যেন কোন্ বিষাদিনী মনোবেদনায় বৈরাগিনী হ'য়ে চলেছে। আকাশভরা চক্ষু যেন তার অশ্রুতে ছলোছলো! কিন্তু কোন্‌টা? দিনের সত্য, না রাত্রির মায়া? সূর্য্যের তীব্র আলোকে পাপ, লজ্জা, হানাহানি, সার্থান্ধতা, ক্রূর কপটতা যে নিজেদের স্পষ্ট প্রকাশ করে তাকেই গ্রহণ করব, না জ্যোৎস্নার আবরণ গায়ে জড়িয়ে এই যে চির বিরহিনী রাত্রি উধাও একাকী শূন্যপথে চলেছে, এর তপস্যাকেই মেনে নেবো? কোন্‌টা?

কাব্যানুভূতির গভীরতার মধ্যে তলিয়ে আমি কেবলই প্রমাণ করবার চেষ্টা করছি যে, আমি পাগল নই। পথটি ধ'রে পাহাড়ের কিনারা দিয়ে চলেছি, এই পথ ধ'রে বহুদূর গেলে 'বউল' গ্রাম পাওয়া যায়। পাহাড়ী গাঁ। যুদ্ধের ফেরত জনকয়েক অকর্ম্মণ্য সৈনিক সেখানে সপরিবারে বাস করে। পথের উপরেই এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালাম। মনে হোলো গত কাল থেকে আমি কেবল মনে মনে প্রলাপোক্তি করছি। কোনো একটা লক্ষণ ধ'রে আমার কল্পনা এত ছোটে কেন? মস্তিষ্ক বিকৃতির এই কি প্রথম চিহ্ন? কিন্তু আর প্রশ্রয়

দেওয়া নয়! আস্তে আস্তে লাঠি নামিয়ে সেই ধূলাবালির উপরেই শুয়ে পড়লাম। নীচের দিকে একটা পা ঝুলিয়ে কাঁকর-পাথরের উপর ওলোট-পালট খেয়ে দেখলাম, ঠিক আছি, কোথাও আমার এতটুকু গোলমাল নেই। ধুলোর উপর গড়াগড়ি দিতে দিব্যি আমার লজ্জা হোলো, হাসি পেলো, মনে হোলো এ নিতান্তই ছেলেমানুষী, এ অকারণ বাহাদুরী! মাথা খারাপ হ'লে অবশ্যই এ সব ভাবতে পারতাম না!

পায়ের খস্ খস্ শব্দ হোলো। ফিরে দেখলাম একটা লোক এদিকে আসছে। সর্ব্বনাশ! এখানে এত দূরে একা পথে গড়াগড়ি দিতে দেখলে লোকটা বল্‌বে কি? সন্দেহক্রমে যদি পুলিশে ধরিয়ে দেয়? চক্ষের নিমেষে সড়্ সড়্ ক'রে গড়িয়ে নীচে নেমে গেলাম—অনেক নীচে, একটা গাছের গোড়ায় গিয়ে থামলাম। লোকটা এগিয়ে এল, বোধ হয় একটু সাড়াশব্দ শুনেছিল, মুহূর্ত্তের জন্য একবার থম্‌কে দাঁড়াল তারপর হঠাৎ গান ধরল এবং সঙ্গীতালাপ করতে করতেই দ্রুতপদে চল্‌তে লাগল। আমাকে ভূত মনে ক'রে সে ভয় পেয়েছে। ভারি স্ফূর্ত্তি হোলো তার দিকে তাকিয়ে। আমি এমন একটা ভীতিজনক আওয়াজ ক'রে উঠলাম তার পিছনে, যা আজ অবধি কোনো মানুষ এবং জানোয়ারের কণ্ঠ থেকে বার হয়নি। লোকটি আর একবার পিছনে ফিরে তাকাল, তারপর অকস্মাৎ হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগল।

কেন মানুষটিকে এমন অকারণে কষ্ট দিলাম! এর ত কোনো হেতু ছিল না! অথচ আমার মানসিক বিশৃঙ্খলাও এতটুকু নেই। যে গাছটার গায়ে আমি এসে ঠেকেছি, উঠে দাঁড়িয়ে সে গাছটিকে আমি জড়িয়ে

আলিঙ্গন করলাম। আঃ প্রকৃতির কী নিবিড় গন্ধ! মৃত্তিকার রসে এর উদ্ভাবন; ইচ্ছা হোলো, এর প্রাণকে নিঃশেষে লেহন করে' নিই। এমনি ক'রে মানুষকেও আমি কোলাকুলি করতে পারতাম। সুস্থ মানুষের মতো, বলিষ্ঠ প্রেমিকের মতো গাছটিকে আমি চুম্বন করতে শুরু করলাম। এত আবেগ, এতখানি উচ্ছ্বাস, নিজ হৃদয়ের এতখানি ঐশ্বর্য্য আমি অনেকদিন অনুভব করিনি!

গায়ে চিন্ চিন্ ক'রে জ্বালা ধরেছিল। আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে পথের উপর উঠে এলাম। পূর্ব্ব-গগনে থালার মতো তখন একখানি পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। দূরে নাগ পর্ব্বতের তুষারাচ্ছন্ন চূড়ায় সে আলো গলিত রূপার মতো ঝল্‌মল্ করছিল।

শীত ধরেছে। কিন্তু আমি নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। একি, সর্ব্বাঙ্গ যে রক্তারক্তি! কেটে কুটে, ছ'ড়ে, আঁচ্‌ড়ে আপাদমস্তক একাকার। বড় আনন্দ, তৃপ্তি! নূতন ক'রে পাওয়া গেল নিজের অস্তিত্বকে। আজ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবো।

হঠাৎ একদিন এক রায়-সাহেব এসে বাসায় উঠলেন। ভদ্রলোক পঁয়ত্রিশ বছর সৈন্য বিভাগে চাকরী ক'রে পেন্সন নিয়েছিলেন। জাতিতে বৈদ্য। গত মহাযুদ্ধের সময় মেসোপোটেমিয়ায় না ফ্রান্সে তিনি লর্ড বার্কেনহেড এবং অনেক গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে একত্র কাজ ক'রে রায়সাহেব উপাধি পেয়েছেন। লর্ড কিচেনার নাকি

বিশেষ স্নেহ করতেন। নমস্কার ক'রে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঙালী দেখে আমার উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। বললাম—এখন কোথা থেকে আসছেন ?

'From Benares'.

ওরে বাবা! বললাম—কাশী থেকে ? ও। কাশীর জলহাওয়া এখন কেমন বলুন ত ?

রায় সাহেব আপাদমস্তক আমার দিকে তাকালেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইলেন, তারপর নাক সিঁটকে বললেন,– Silly question! যাবে নাকি সেখানে এক্ষুণি যে জানতে চাইছ ? Nonsense !

অত্যন্ত রাশভারি লোক, এখানকার অনেকেই চেনে। লোক পরম্পরায় অবগত হলাম, চাকরির সাধ তাঁর এখনো মেটেনি। যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন বৃটিশ জাতির সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করতে চান্। এখনো বিশ বছর তিনি পরিশ্রম করতে পারেন। সংসারে তাঁর এক বিবাহিতা কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই! কন্যা ও জামাতা নাকি সম্প্রতি দেশের কাজে নেমেছেন, রায়-সাহেব তাই তাঁদের জন্মের মতো পরিত্যাগ করেছেন।

'এখানে চাকরি করবার আগে কি করতে হে তুমি ?'

'এই আর কি, বিশেষ কিছু না।'

'Vagabond ? কংগ্রেসে ছিলে দেখে মনে হচ্ছে! Rascals. চাবুক মেরে গায়ের চামড়া ফাটিয়ে দিতে হয়! Ungrateful dogs. বলি পায়ে ত এখনো তেল দিচ্ছ! এমন চাকরী দেয় কে ? ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্ট হ'লে ভাত জুটবে ? আধন্যাংটা গান্ধীর লাথি খেতে হবে।

আগে ত ছিলে wild beast, কাপড় পরতে শেখালে কে? Societies-তে মিশবার decent training পেলে কোথা থেকে? Silly ass!—বিশুন্, এই বিশুন্, এক ছিলম তাম্বাকু দেও।'

তামাকু সেবন ক'রে কথঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হলেন। আমি ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাসায় এলাম। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি ঘর আর আমার নেই! জীর্ণ শয্যাগুলি দরজার কাছে জড়ো করা, বাক্সটা মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে, ছোটখাটো জিনিষপত্রগুলি এদিকে ওদিকে ছড়ানো। ঘরটি রায়-সাহেব নিজের সাজ আসবাবসহ দখল করেছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি! আমার খাটিয়াখানি শুধু বহিস্কৃত করেন নি সেখানি তাঁর নিজের কাজে লাগবে। ডেকে বললেন, লোকজন আসবে কিনা, এই ঘরটায় তবু একটু আলো-হাওয়া আছে। তা ছাড়া আমার 'প্রেষ্টিজ্—'

বললাম, তা ত বটেই, বেশ করেছেন।

তিনি বললেন, ভালই হয়েছে, তোমার বিছানাপত্র ত তেমন বিশেষ নেই, চিম্‌নির পাশে ও-ঘরটাতে হাওয়াও কম, তোমার সুবিধেই হবে। বিশুন্‌কে এক পাশে জায়গা দিয়ো—

ময়লা বিছানাগুলি পাশের ঘরে টেনে টেনে নিয়ে চললাম। একটি দরজা ছাড়া ঘরটিতে আর কোনো জান্‌লা নেই, একপাশে থাকে কাঠ ও কয়লা, আর একদিকে কতকগুলি ভাঙা হাঁড়ি, টিনের কানেস্তারা, কেরোসিন তেল, ঝাঁটা, মর্‌চে-ধরা বাল্‌তি, এবং একটী দড়ি-ছেঁড়া 'চারপাই'। নিরুপায় হয়ে এই ঘরটিকেই আশ্রয় করা গেল।

দিন চল্ছে। ঠাণ্ডার শীত নিবারণ হয় না! কম্বলের এক অংশ পেতে আর এক অংশ গায়ে মুড়ে থাকি! জঙ্গলের মধ্যে 'পিশু' পোকার প্রাচুর্য্য দেখা দিল। অযত্নের বিছানাগুলিতে ঢুকে সমস্ত রাত তারা গায়ের রক্ত শোষণ করে। সমতার লেশমাত্র কোথাও নেই, অসহ্য হ'লে চীৎকার করে গান গেয়ে উঠি। ছোট দরজা দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে ঢুকি, চৌকাঠে একদিন ঠুকে মাথা দিয়ে রক্ত পড়ল। একদিন চারপাইর দড়ি ছিঁড়ে অর্দ্ধেক রাত্রে মেঝের উপর আছাড় খেলাম।

রায়-সাহেবের লাঞ্ছনা সয়ে গেছে। ইংরাজজাতির গুণ ব্যাখ্যার সময় তিনি মুখর হয়ে উঠেন। আমাকে 'স্বদেশী' দলের লোক মনে ক'রে তিনি একদিন মাটীতে ছড়ি ঠুকেছিলেন। কংগ্রেস তাঁর চোখে জুয়াড়ীর আড্ডা, দেশের নেতারা তাঁর চোখে নরাধম, ছেলেরা তাঁর কাছে বদমায়েস্, যে-কোনো মেয়ে তাঁর বিবেচনায় অসতী। সাহিত্যটাকে তিনি মনে করেন যৌন-অসংযমের কুৎসিত বিজ্ঞাপন। সমাজে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, দেশ বিদেশে যে অগ্রগতি, সমস্তই তাঁর বিচারে অতিরিক্ত পীড়াদায়ক নষ্টামী। মনের ভিতর তাঁর যেন একটা বর্ব্বর পশু সকলকে দংশন করবার জন্য হাঁ করে রয়েছে।

বৃষ্টির ধারা করোগেটের ছাদ বেয়ে পড়ে। ঝড়ে ধূলো ঘরে এসে ঢোকে! ঝম্ ঝম্ ক'রে জলের ধারা ফুটো শার্সির গা বেয়ে বিছানার উপর নেমে আসে। রাত্রে অন্ধকারে উঠে প্রকৃতির মাঝখানে জেগেই বসে থাকি।

একদিন ঘর থেকে বেরোলাম না। অনেক বেলায় রায়-সাহেব এসে কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, Idle, invalid creature,—কি হ'ল কি?

বললাম, বোধ হয় একটু জরভাব—

জর!—ব'লে তিনি হঠাৎ কাছে ব'সে কপালে হাত দিলেন! মনে হোলো এ-হাত যেন তাঁর নয়, এ অন্যের! নিশ্বাস ফেলে বললেন, এখুনি ডাক্তার বেদী-কে আন্‌ছি, অমনি ওষুধও আন্‌ব, কেমন? কি খাবে বলো ত? আচ্ছা, সে আমি আন্‌ব বুঝেসুঝে।—কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রায়-সাহেব বললেন, you badly need a good nursing. আমার ওপর খুশি নও, কিন্তু এ-সময়ে আমার ওপর রাগ ক'রে নিজের ক্ষতি ক'রো না, বাবা। মনে পড়ে মার্সাইতে থাকতে একদিন আমার জর হয়েছিল, মিষ্টার জোন্স্ সেদিন··· দাঁড়াও, এখুনি ওষুধ নিয়ে আসবো।—বলে' তিনি নিজের গায়ের গরম র‍্যাপারটা আমার গায়ের উপর অতি যত্নে জড়িয়ে দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন; তিনি যেন অস্বাভাবিক রকম ব্যস্ত।

বিস্ময়ে আমি হকচকিত, উদ্‌ভ্রান্ত। এও কি সম্ভব? ইনি কি সেই রায়-সাহেব?

দরজার বাইরে দূরে একটা গাছ হাওয়ায় দুল্‌ছিল, তারই দিকে নিমেষ নিহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কেন আসে চোখে জল? নির্দ্দয়ের ভিতরে হৃদয়ের সন্ধান পেলে মন কেন আবেগে ব্যাকুল হয়, মানব-চরিত্র-রহস্যের সেই গোপনতম তত্ত্ব কি কোনো দিন পাওয়া যাবে না?

মন বলছে, কী নিয়ে তুমি দিন কাটালে? বেলা গেল, পারের কড়ি সঞ্চয় করেছ কি? খুঁজে পেয়েছ কি তাকে, যার জন্যে তোমার এত খোঁজাখুঁজি?

কী উত্তর দিই! নিজের সুখদুঃখ, ভালো মন্দ, নিজের হিতাহিত, নিজের জীবন সংগ্রাম—এর চেয়ে স্বার্থপরতা আর কী আছে সংসারে? পদে পদে মন বিদ্রোহ করছে। বলছে, ভেঙে দাও, সাঙ্গ করো এই খেলা, চ'লে যাও যেদিকে তোমার দুই চোখ যায়, দুই অঞ্জলি তুলে প্রার্থনা করো,—যে পথ দিয়ে আসবে তোমার আত্মার পরম পরিতৃপ্তি!

গাছের পাতা কাঁপলো, বুকের ভিতরকার রক্তকমল তারই বাণীর সঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলো, সীমান্ত প্রদেশের প্রান্তর মায়াময় জ্যোৎস্নায় পরিপ্লাবিত হোলো, সেই রহস্যময় শূন্যলোকের ভিতর দিয়ে এসে পৌঁছলো অসীমকালের করুণ আহ্বান। সঞ্চয় কিছু নেই, পারের কড়ি নেই,—তবু চির-বিদ্রোহী মন বললে,

'তীরের সঞ্চয় তোর প'ড়ে থাক্ তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে
সম্মুখের বাণী নিক্ তোরে টানি' মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে, অকূল আলোতে।'

দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। সাহেবিআনা ছিল, সঙ্গে ছিল অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা,—খোলসের মতো তারা খ'সে গেল। 'নাড়িতে নাড়িতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি।' আপন প্রাণের উন্মাদনায় সকল বন্ধন বিদীর্ণ ক'রে শীতের গভীর রাত্রে একদা পথে নেমে এলাম।

'যাবো যে কী ক'রে
এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।

বন্ধন গেল, জীবন সংগ্রাম শেষ হোলো, বন্ধুজনের মায়া-মমতা কাটলো—কোনোদিকে আর ফিরে তাকাবার নেই, কোথাও আর আশ্রয় নেই। আমি পরিব্রাজক, আমি চিরকালের গৃহচ্যুত মানুষ—এই আমার বড় পরিচয়। পথে পথে বাঁশী বাজাবো, ধূলায় ধূলায় পাতবো আসন, সমস্ত ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে আপন প্রাণের রস ঢেলে বিচিত্র জীবন যাপন ক'রে যাবো, এই আমার পরম কামনা। এখন থেকে মুক্তপক্ষ পাখীর মতো আমি বাধা বন্ধনহীন—এই আমার ভালো। ঘরে আর ফিরবো না!

হিন্দুস্থানগামী গাড়ীতে চ'ড়ে বসেছি। অন্ধকার থেকে অন্ধকারের দিকে ট্রেণ চলেছে দ্রুতগতিতে। চোখে জল আসছে কেন জানিনে। আজ থেকে আমি বৈষয়িক উন্নতির সরল অভিলাষ পরিত্যাগ করলাম, হয়ত সেই কারণেই এই অশ্রু! অন্ধকার গাড়ীর ভিতরে বসে কম্পিত-কণ্ঠে মহাকবির একটি কবিতার কয়টি চরণ উচ্চারণ ক'রে চলেছি—

হে মহাজীবন, হে মহামরণ
লইনু শরণ, লইনু শরণ!
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা,
করহে আমার লজ্জাহরণ, পরশ রতন,
তোমারি চরণ লইনু শরণ, লইনু শরণ!'

অমৃতশহরে নামলাম পরদিন। জনারণ্যে, কোলাহলে, যানবাহনে নিজের নির্জ্জনতাটা মুখর হয়ে উঠলো। কাল রাত্রের মানুষ আমি,

আজ আমার অন্য চেহারা। দৃশ্যদর্শক হিসাবে টাঙাগাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী চললো 'ঘণ্টাঘরে'র দিকে, বাজারের ভিতরে-ভিতরে, জনতার পাশ কাটিয়ে। অমৃতশহরের বাজার রেশমের জন্য বিখ্যাত।

পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যভারতের অনেকগুলি শহর প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, মাঝে মাঝে পারাপারের জন্য সিংহদরজা দেখা যায়। অমৃতশহরে প্রাচীর নেই, কিন্তু লাহোর ও দিল্লীর মতো দরজা আছে। এমনি দু একটি 'গেট' পার হয়ে জনবহুল বাজারের ভিতর দিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়ালো 'ঘণ্টাঘরে'র কাছে। দিল্লীর চাঁদনী চকের মতো এখানকার ঘণ্টাঘরেও প্রকাণ্ড একটা 'টাওয়ার ক্লক্'। চেয়ে দেখলাম বেলা এগারোটা বাজে।

নিকটেই বাঁধানো প্রকাণ্ড সরোবর। সরোবরের ঠিক মাঝখানে শিখসম্প্রদায়ের স্বর্ণমন্দির। মন্দিরে যাতায়াতের জন্য পশ্চিম পাড়ে একটি শ্বেতপাথরে বাঁধানো সাঁকো। দৃশ্যটি সুন্দর একটি ছবির মতো। সরোবরে বহুসংখ্যক শিখ তাঁদের দীর্ঘ চুল এলো ক'রে স্নান ও পূজায় বসেছেন। নগ্নপদে সাঁকোর উপর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা গেল। ভিতরে কয়েকজন পূজারী ধূপ, ধুনা, চন্দন, ঘৃতপ্রদীপ, ফুল ও চামর সহযোগে 'গ্রন্থ সাহেবের' পূজায় বসেছেন। প্রকাণ্ড একখানা বই, তাঁরা এই বইখানির পূজা করেন। মন্দির-গাত্রে তাঁদের সম্প্রদায়ের মহাপুরুষের চিত্র টাঙানো। মন্দিরটি শুচিশুভ্র, শ্বেতপ্রস্তরময়, দরজাগুলি—যতদূর মনে পড়ে—রৌপ্যময়! মন্দিরের বহির্ভাগ হিরণ্যকাণ্ড। সূর্য্যকিরণে সেই মন্দির সারাদিন ঝলমল করে। হিন্দু ও শিখসম্প্রদায়ের পূজাবিধিতে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। থাকার কথাও নয়।

গাড়ী ঘুরিয়ে উত্তরপূর্ব্ব দিকে একটি সঙ্কীর্ণ জনবহুল পথে চললাম। চারিদিকে তুলা, কাপড় ও বাসনের দোকান। কিছু দূরে এসে গাড়ী থাম্‌ল! গাড়োয়ান বল্‌লে, বাবু, জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখ্‌ লেও। সরকারকে গোলিমে বহুৎ আদমি হিঁয়া মরে হুয়ে থে!

জালিয়ানওয়ালাবাগ শুনেই সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হোলো। এই নামের জায়গাটা আগেও ছিল, পরেও থাকবে। তবু কেন জানিনে, এই নামটার সঙ্গে শোচনীয় মৃত্যুলীলার বীভৎস কাহিনী চিরদিনের জন্য ভারতের ইতিহাসে জড়ানো থেকে যাবে মনে হয়।

গাড়ী থেকে নামলাম। দরজার গায়ে একটি ডাকঘর। পাশেই সরু পথ ভিতর দিকে চ'লে গেছে। ভিতরে একটি সুসজ্জিত উদ্যান। উদ্যানের চারিপাশে ঘন বসতি। একদা এখানে রক্তের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল, সেই রক্তে জন্ম হয়েছে মুক্তিকামী নব ভারতের! স্বাধীনতা-লাভের সেই ত সূচনা!

পরদিন পুরাতন দিল্লীতে এসে নামলাম। আবার দিল্লী! আজ ষ্টেশনটা যেন কেমন ভালো লাগছে,—পুরাতন বন্ধুর মতো সে যেন আমাকে সস্নেহে ঘিরে দাঁড়িয়ে বললে, প্রিয়, ভালো আছো ত? কোথা ছিলে এতদিন?—অনেকটা এমনিই বটে। ষ্টেশনের সব মানুষগুলি যেন আমার পরিচিত; প্রাসাদের মতো অট্টালিকা, প্ল্যাট-ফরমের মাঝখানে একটি রেলিংঘেরা বারান্দা, ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানদিকে গিয়ে ভিক্‌টোরিয়া গার্ডেন্‌স্‌, তার পাশ দিয়ে চাঁদনীচকের

রাস্তা—এরা সবাই যেন আমার অনেকদিনের অনেক দীর্ঘশ্বাসের সাক্ষী। এ যেন আর বিদেশ নয়,—আমি যেন আমার বহু পুরাতন ও বহু পরিচিত সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

পুরাতন দিল্লী প্রাচীরবেষ্টিত শহর। প্রাচীরের পশ্চিম দিকে নূতন দিল্লী আরম্ভ। তার চৌমাথা-কেন্দ্রের নাম 'কনট্ প্লেস।' আধুনিক শহরের সজ্জায় চক্রাকার চৌমাথা সুসজ্জিত। সুতরাং সেদিকে কোনো বৈচিত্র্য নেই। নূতন দিল্লীর একান্তে ফিরোজ শা কোটলার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মহাকালের ভ্রূকুটির সাক্ষ্য দিচ্ছে। দূরের পথ দিয়ে সফ্দারজঙ্ অর্থাৎ লক্ষ্ণৌয়ের প্রথম নবাবের সমাধির দিকে যাওয়া যায়, সেই পথ ধ'রেই দক্ষিণে কয়েক মাইল গেলে কুতবমিনার। পথের দুইদিকে বিশাল প্রান্তর—কত রাজ্য ও কত জাতি সেই প্রান্তরের শ্মশানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত!

পুরাতন দিল্লী শহরের ঠিক মাঝখানে গগনচুম্বী বিরাট জুম্মা মসজিদ। লাল পাথরের মিনার ও তোরণ বহুদূর থেকে লক্ষ্য করা যায়। এক মাইল পূর্ব্বদিকে দিল্লীর বিশাল দুর্গপ্রাকার। আপন মহিমায় ও ঐশ্বর্য্যে সে উন্নতশির। দক্ষিণে প্রবেশপথ, সেখানে গোরাসৈন্য পাহারা দিচ্ছে। তোরণের উপরে বিখ্যাত নহবৎখানা। দুর্গের ভিতরে ঢুকে প্রথম সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত নানা রকমের প্রদর্শনীয় অস্ত্রশস্ত্র দেখা যায়। নিকটে কয়েকটি আধুনিক কালের সৈন্যদলের ব্যারাক্ দণ্ডায়মান। ইংরাজগণের জয়ের চিহ্ন চারিদিকে সুপরিস্ফুট। প্রথম দিকে দেওয়ানি আম, তারপর দেওয়ানি খাস, মহিষীগণের অন্দরমহল, স্নানাগারগুলির বিস্ময়কর বৈচিত্র্য, মার্বেল পাথরের হল্, ময়ূর-সিংহাসনের স্থান,—ইতিহাসের স্বপ্নময় রাজ্যে

কৌতূহলী মন বিচরণ করতে থাকে, অবসাদে যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে আসে। অদূরে শীর্ণ স্তিমিত যমুনার ধারা জীবন-মৃত্যুর উত্থান-পতনের রহস্যময় প্রশ্ন নিয়ে আজও তেমনিভাবে বয়ে চলেছে।

এবার কোন্‌দিকে যাই? দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে চলেছি, এতক্ষণ নিজের কথাটা মনেই ছিল না। ঐতিহাসিক দৃশ্যের পরিচায়ক আমি নই, নোটবুকে দফায় দফায় স্থান, কাল ও দৃশ্যের সংখ্যা টুকে রাখা আমার কাজ নয়। আমি পরিব্রাজক। নানা পথের নানান্ বৈচিত্র্য নিয়ে নিজেকে ভুলতে পারি, কিন্তু অকারণ অসংলগ্ন কথায় নিজেকে ভোলানো আমার পক্ষে কঠিন। আমি পরিব্রাজক, আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্য নেই।

এবার কোন্‌দিকে যাবো? লোককোলাহলের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার ভাবলাম। শীতের বাতাসে পথে পথে উড়ছে ধুলো, দুর্গ প্রাকারের বাইরে জনবিরল উঁচু নীচু মাঠে গাছের ছায়ায় এক-আধজন জীবনবৈরাগী ফকির ব'সে ভিক্ষা করছে, হাওয়ায় ভেসে আসছে দূর থেকে ট্রেণের বাঁশীর আওয়াজ,—সেই মাঠের ধারে ব'সে ভাবলাম, এবার কোন্ পথে? বহুকাল দেখিনি আমার শস্যশ্যামল বাঙলা দেশ, যাবো কি ফিরে দেশে? হ্যাঁ, ফিরেই যাই!

রাত্রে স্টেশনে কাটিয়ে অতি প্রত্যুষে ট্রেণ ধরা গেল। কিন্তু ইতি মধ্যেই স্থির করেছি, দেশে এখন ফিরবো না, হরিদ্বারে যাবো। হরিদ্বারে গঙ্গার ধারে কিছুকাল আশ্রয় নেবো, হৃষিকেশের নীলধারায় স্নান করবো, লালতারাবাগে স্বামীজীর ওখানে কিছুদিন ভাগবতের কথা শোনা যাবে। শ্রান্ত ক্লান্ত মনের উপরে নূতন রসের ধারা ঢেলে দেবো।

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের পর জানা গেল, এ গাড়ী যাবে না হরিদ্বারের পথে, এ যাবে মীরাট ও কুরুক্ষেত্র হয়ে আম্বালার দিকে। কী জ্বালা! হরিদ্বারের টিকিট অথচ যাবো কুরুক্ষেত্রের দিকে? কী জ্বালা! কিন্তু কোনো ব্যস্ততাই আমার দেখা গেল না; গত রাত্রে নিদ্রা হয়নি, সুতরাং কম্বলটি বেঞ্চের উপর বিছিয়ে নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুলাম। দেখা যাক্, গাড়ীখানার দৌড় কতদূর!

নামলাম কুরুক্ষেত্র স্টেশনে। ছোট স্টেশন, দু'চারটি যাত্রী নামাওঠা করল। চারিধারে বিস্তীর্ণ প্রশান্ত মাঠ, বাবলা ও ফণীমনসার জঙ্গল, সেই মাঠের আগাছার ডগায় ডগায় প্রভাতের শিশিরবিন্দুগুলি তখনো শুকোয়নি, এত বেলাতেও রৌদ্রের কিরণে ঝলমল করছে। দু'একজন মানুষের কথাও এই নির্জ্জনতার ভিতরে প্রনিধ্বনিত হ'তে লাগল। কুরুক্ষেত্র ভারতের একটি প্রধান তীর্থ।

দু'একজন পাণ্ডা এসে দাঁড়ালো। তাদের আশ্রয় ক'রে স্টেশনের খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। পাণ্ডারা অনেক সময়ে বিনা টিকিটের যাত্রীদের বাঁচিয়ে দেয়।

পাথর কাঁকরের পথ। আশপাশে এক আধখানা কাঁচা পাকা ঘর। জীবনের ধারা অতি ক্ষীণ। দু'একটি বিপণি বেসাতি। কিছুদূর এসে একটি ধর্ম্মশালা পাওয়া গেল। ধর্ম্মশালাটি এক বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত,—তিনি কলিকাতার বিখ্যাত রাজেন মল্লিক। ভিতরে প্রকাণ্ড উঠান, দক্ষিণদিকে বড় একটা ইঁদারা,—কিন্তু সংস্কার অভাবে বাড়ীখানা

জীর্ণ, ঘরগুলির অবস্থাও তেমন ভালো নয়। তাদেরই এক পাশে ব'সে পাণ্ডার হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বললাম, তুমি যাও পাণ্ডাজি, দানপুণ্য করতে আমি আসিনি।

লেকেন্ কুরুচ্ছেত্তরমে যেত্‌না আদ্‌মি আতা হ্যায়—

জানি সবাই পিণ্ডদান করে, কিন্তু আমার পিণ্ড পাবার কেউ নেই। পাণ্ডাঠাকুর, তুমি যাও।

ক্ষুব্ধ হয়ে পাণ্ডাজি একটি টাকা হাতে নিয়ে চ'লে গেলেন!

নির্জ্জন ধর্ম্মশালা। তার চেয়ে নির্জ্জন আমি। আমি অত্যন্ত একা। কোথাও আত্মীয়তা নেই, স্নেহের ছোঁয়াচ নেই। এক সময়ে দু'একটা পথের কুকুর এসে ভিতরে টহল্ দিয়ে চ'লে গেল, দু'চারটি দাঁড়কাক এসে খোঁজ নিয়ে গেল। নীরবে আমি ব'সে রইলাম। সুমুখের ভাঙা পাঁচিলে উঠে দাঁড়িয়েছে নূতন অশ্বত্থের চারা, কবে কোন্ কালের ফুৎকারে এই ধর্ম্মশালারই একখানা ঘর ভূমিসাৎ হয়ে রয়েছে, বড় দরজার একটা কপাট ভেঙে কাৎ হয়ে পড়েছে, ওদিকে ইঁদারার ধারে স্তূপীকৃত প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপ। চারিদিকে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, কিন্তু গভীর রাত্রির মতো দিগ্‌দিগন্ত নিঃশব্দ ও নির্জ্জন। কেন যে নিবিড় ক'রে সব ভালো লাগছে, কেন যে সমস্ত অন্তর মথিত ক'রে চোখে আসছে জল, বলতে পারিনে, বোঝাতে পারিনে। কেন ছেড়ে দিলাম সব? কেন হ'লাম না গৃহগতপ্রাণ?

এক সময় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বড় ক্লান্ত, পা টেনে চলা যায় না। ধর্ম্মশালা থেকে বেরিয়ে পূর্ব্বদিকের একটা চওড়া পথ ধ'রে চললাম। তখন মধ্যাহ্ন। শীতের শুক্‌নো হাওয়া ধুলো উড়িয়ে চলেছে। এক আধখানা টাঙা চলেছে পথের ধার দিয়ে।

দূরের মাঠের পথ দিয়ে উটের সারি যাচ্ছে, তাদের গলার ঘণ্টার শব্দ দূরান্তরের প্রান্তরে-প্রান্তরে অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্যের বাণী বহন ক'রে ফিরছে। কেমন যেন একটা যন্ত্রণা জেগে উঠছে বুকের ভিতর দিয়ে। আমি যেন আমার বর্ত্তমান দেহের বন্ধন খুলে সুদূর অতীতে প্রাচীনকালের পরিবেষ্টনে চ'লে গেছি। কী অদ্ভুত অস্বাভাবিক অনুভূতি! নিজের ভিতরে নিবিড়ভাবে অনুভব করছি আর একজন মানুষকে, আমার বক্ষপঞ্জরের মধ্যে তার চিরস্থায়ী বাসা,—সে এক জটাজূটধারী প্রাচীনকালের বৃদ্ধ তপস্বী, পৌরাণিক ভারতের সকল কাহিনীর সে সাক্ষী,—কালক্রমে সে যেন আমার বুকের ভিতর এসে আশ্রয় নিয়েছে! আমি যেন হারিয়ে গেছি, তলিয়ে গেছি, অন্ধ হয়ে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি—কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আমার পথ, সব একাকার হয়ে গেল। দিনরাত্রির অতীত কোনো পৃথিবীতে আমার প্রাণ যেন অবাধে বিচরণ করতে চ'লে গেছে।

চমক ভাঙলো, দেখি একটা গাছের ছায়ায় স্তম্ভিত হয়ে ব'সে আছি, আপন বক্ষের দ্রুত স্পন্দন অনুভব ক'রে বিস্মিত হলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার উঠলাম। সেই একই পথ, তেমনি মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য্য জ্বলছে, সেই ঘূর্ণী হাওয়ায়-হাওয়ায় ধূলোয়-ধূলোয় গাছপালার সরসরানি শুনতে পাচ্ছি। পথ তেমনি জনবিরল। যেতে যেতে দক্ষিণে পাওয়া গেল থানেশ্বর শহর। মাঝখান দিয়ে যতদূর মনে পড়ে একটা ভাঙা রেলপথ চ'লে গেছে। থানেশ্বরের সুবিশাল ধ্বংসস্তূপ। জনমানব কোথাও নেই। ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতি জীর্ণ কয়েকখানা প্রাসাদের কাঠামো,—দেয়ালগুলি আছে মাত্র, আর কিছুই নেই। রৌদ্রে, জলে, ঝড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে কতকাল

থেকে এগুলি তিলে তিলে ক্ষয় হ'য়ে চলেছে কে জানে! কা'রা ছিল এখানে? কোথায় গেল তারা? খেলা ক'রে গেছে সঙ্গে, রাজ্য গেছে রসাতলে, হাসি-কান্না কালের ফুৎকারে ধূলোর সঙ্গে মিলিয়ে গেছে,—আজ তাদের আর কোনো চিহ্ন নেই। ভগ্নস্তূপের জটলায় কোথায় ঘুঘু ডাকছে করুণ কণ্ঠে, কাঠবিড়ালী ছুটছে পাঁচিলে পাঁচিলে, কালো বিড়াল ঘুরছে কেঁদে কেঁদে,—তাদেরই মাঝখানে গিয়ে একখানা পাথরে ব'সে পড়লাম। যেন কথা আছে বলবার, কথা আছে শোনবার! আশেপাশে, কাছে দূরে, ডাইনে বাঁয়ে আর কোথাও কিছু নেই—কেবল প্রাচীনের প্রচুর ধ্বংসাবশেষ। আমি যেন এদেরই মত একজন পুরাকালের প্রতিনিধি। প্রত্যেকটি ইঁটপাথরে, দেয়ালের গায়ে, কাঁঠালতলায়, জঙ্গলের জটলায় কী যেন কাহিনী গভীর অর্থে ভরা, এরা আমাকে এনেছে সেই রহস্যময় লিপি পাঠ ক'রে শোনাতে। নির্জ্জন মধ্যাহ্নে একাকী আমার চোখের সম্মুখে এদেরই ভিতর দিয়ে পাথর ও জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে এক জরাশীর্ণ তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা এসে দাঁড়ালো অঞ্জলি পেতে। বললে, যদি এসেছ তবে জল দাও, যুগ-যুগান্তরের তৃষ্ণা মিটিয়ে যাও। তার পিছনে শত শত অনুচর,—ক্ষুধার্ত্ত, উলঙ্গ, কঙ্কালসার প্রেত-প্রেতিনীর দল! তাদের কোলাহলে, চীৎকারে, প্রার্থনায়, তাদের অদ্ভুত, অর্থহীন বাক-বিতণ্ডায় আমার জাগ্রত চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এলো। আমি শক্তিহীন, অনড়, অবশ,—পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে পাথরের মতো ব'সে রইলাম। ভয় পর্য্যন্ত ভুলে গেছি।

পূর্ব্বপথে আবার চললাম। আর যেন হাঁটতে পারিনে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় শরীর কাতর। অবসন্ন মন। দেশের কারো খবর জানিনে, অস্থায়ী ঠিকানায় কেউ দেয় না চিঠি। হরিদ্বারে গিয়ে কিছুকাল বাস করবার কথাটা ভুলিনি। নানাকথা মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে চলেছে।

কিছুদূর গিয়ে বাঁহাতি প্রকাণ্ড এক বটগাছের ছায়ায় এক মন্দিরেব চিহ্ন দেখা গেল। মন্দির যেন হিন্দুব পরম আশ্রয়, তার কাছে দাঁড়ালে কেমন যেন নিজেকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ ব'লে মনে হয়! যেন সকল অভাব ওখানে মেটানো যায়। পথ পার হয়ে মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম; পূজারী জানতে চাইলেন, সরোবরে স্নান করেছি কিনা।

কোন্ সরোবর?

তিনি জানালেন, পাশেই দ্বৈপায়ন হ্রদ, ওদিকে কুরুক্ষেত্র, নিকটে ভদ্রকালীর মন্দির - অষ্টভুজা প্রতিমা। স্নান ও দর্শন হয়ে গেলে এখানে সামান্য প্রসাদ পাওয়া যাবে। এখানে পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদান করা বিধি।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসান হয়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ দেহত্যাগ করেছেন। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছেন দেহত্যাগ। কুরুকুল বিধ্বস্ত। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, পরিচিত —সকলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেছেন। রাজা যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ শোকার্ত্ত। পুরনারীগণের চোখে অশ্রু শুকায় না। ধর্ম্মের জয় হয়েছে, কিন্তু এই কি জয়ের চেহারা? রাজ্য কাদের নিয়ে? কাদের নিয়ে সুখ-ঐশ্বর্য্যভোগ? কে দেবে বংশে বাতি? থাক্ রাজ্য, থাক ঐশ্বর্য্য—কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, ফলে আর লোভ নেই। শ্রান্ত ও মুহ্যমান ধর্ম্মরাজ বললেন, চলো ভ্রাতৃগণ, দ্বৈপায়নে পিণ্ডদান ক'রে

স্বর্গারোহণের পথে যাই। এ সংসারে সকল কাজ আমাদের শেষ হয়ে গেছে।—পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়ে চলো যাত্রা করি মহাপ্রস্থানের পথে।

তথাস্তু ধর্ম্মরাজ। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দেবী দ্রৌপদী তাঁর অনুসরণ করলেন।

ধীরে ধীরে দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে এসে দাঁড়ালাম। কোমল নীল জল। শীতল, স্নিগ্ধ। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে, ঘনবৃক্ষচ্ছায়ায়, সুনিবিড় নির্জ্জনতায়; পৌরাণিক কালের হাওয়ায় মন বললে শান্তি, শান্তি! চোখে কান্না আসছে, বুকের রক্ত আনন্দ ও বেদনায় দুলে উঠছে। এই সরোবরের তীরে, এই পাথরের সিঁড়ির ধারে, যেন সেই প্রাচীন মহামানবগণের পদরেণুর স্পর্শ অনুভব করছি। তাঁদের অশরীরী আত্মা যেন আমার চারিপাশে গুঞ্জন ক'রে বলছে, তুমি হিন্দু, হিন্দুকুলে তোমার জন্ম হয়েছে, তুমি ধন্য হয়েছ। তুমি আমাদেরই পরমাত্মীয়!

পাখী ডাকতে লাগলো বৃক্ষশাখায়, মৃদু মন্দ স্নিগ্ধ বাতাস বইতে লাগল, মন্দিরে বাজছে আরতির ঘণ্টা,—ক্লান্ত আমি আর এখান থেকে উঠবো না। সরোবরের কিনারায় পাথরের সিঁড়িতে সর্ব্বশরীর মেলে দিয়ে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লাম। তন্দ্রায় তখন আমার চোখ জড়িয়ে এসেছে।

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
ও পরিচয় প্রেস, ৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীকুবভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত